Vol. 51 | No. 1 | 2013

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

গণআন্দোলন ও পার্টি-রাজনীতি : চিলেকোঠার সেপাই-র অভিজ্ঞতা

Volume	51
Issue	1
Year	2013
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Mohammad Azam
Published online	October 1, 2013
DOI	10.62328/sp.v51i1.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v51i1.2
Pages	২১-৪৮
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সাহিত্য পত্রিকা ॥ বর্ষ : ৫১, সংখ্যা : ১ ॥ কার্তিক ১৪২০ ॥ অক্টোবর ২০১৩

গণআন্দোলন ও পার্টি-রাজনীতি : *চিলেকোঠার সেপাই*-র অভিজ্ঞতা

Check for updates

মোহাম্মদ আজম*

চিলেকোঠার সেপাই উপন্যাসের বিষয় বাংলাদেশের ইতিহাসের এক সুপরিচিত অধ্যায় — উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান। সত্তরের নির্বাচন আর একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সাথে কার্যকারণ-সম্পর্কে যুক্ত এই অভ্যুত্থানের ঘটনাক্রম ও জাতীয়তাবাদী তাৎপর্য লেখক এ উপন্যাসে বিশ্বস্ত ভঙ্গিতেই তুলে এনেছেন। তাতে প্রভাবশালী পার্টিগুলোর কার্যক্রম যেমন উঠে এসেছে, তেমনি শহর-গ্রামের আলাদা বাস্তবতাও চিহ্নিত হয়েছে। ইলিয়াস তাঁর বিশিষ্ট ভাষাভঙ্গি, অতুলনীয় ডিটেইল আর জীবনদৃষ্টির স্বাতন্ত্র্যে বহুস্তর ইতিহাসকে অনায়াসেই আঁটিয়ে নিয়েছেন উপন্যাসের আদলে। ইতিহাসকে উপন্যাসে রূপান্তরের সময় স্বভাবতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে লেখকের মূল্যায়ন ও পক্ষপাত। উপন্যাসসুলভ নিরাসক্তি অক্ষুণ্ন রেখেই লেখক দেখিয়েছেন, পার্টি-রাজনীতি ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দিক থেকে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান সফল হলেও গণআন্দোলনের মধ্যে বিচিত্র শ্রেণি-পেশার মানুষের যে আকাঙ্ক্ষা আর সম্ভাবনা জেগে উঠেছিল, তা সফল হতে পারেনি। ক্ষমতালিপ্সু আপসকামী পার্টি-রাজনীতিই এর প্রধান কারণ। অন্য কারণ মধ্যবিত্তের অপ্রস্তুতি। এ উপন্যাসে গণআন্দোলনের যে সংজ্ঞায়ন ঘটেছে, আন্দোলনের সূচনা ও সমাপ্তিতে পার্টি-রাজনীতির ভূমিকা আর উত্তুঙ্গ মুহূর্তগুলোতে আম-জনতার সক্রিয়তা যেভাবে চিহ্নিত হয়েছে, তা এক 'বেহাত বিপ্লবে'র কথাই বলে।

স্পষ্টতই শ্রেণি-রাজনীতির প্রতিই লেখকের পক্ষপাত। কিন্তু এই পক্ষপাত শ্রেণি-রাজনীতির বিপ্লবী তত্ত্বের ভিতে দাঁড়ায়নি। বরং বিদ্যমান ব্যবস্থার বহুমাত্রিক অন্যায্যতাই — উৎপাদন ও বণ্টনে বুর্জোয়া-বিধির স্বচ্ছতা আর যুক্তির অনুপস্থিতি — তাঁর সিদ্ধান্তের ভিত্তি। বিদ্যমান জাতীয়তাবাদী পার্টি-রাজনীতি কর্মসূচির সীমাবদ্ধতার কারণেই এই অন্যায্যতার প্রতিকার করতে পারবে না। যাদের সেই কর্মসূচি আছে, তারা কি পারবে? ইলিয়াস এ প্রশ্নে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাননি। কিন্তু গণ-মানুষের মুক্তির রাজনীতির কিছু তত্ত্বীয়-প্রায়োগিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা আছে *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসে, যেখানে দেখা যায়, শ্রেণি-রাজনীতি কেবল জ্ঞানগত ফায়সালার ব্যাপার নয়, বরং গভীরভাবে সাংস্কৃতিক ও জীবনযাপনপদ্ধতির ব্যাপার। গণআন্দোলনে জেগে ওঠা সম্ভাবনার নিরিখে নতুন পার্টি-রাজনীতির তত্ত্বায়নচেষ্টা এ উপন্যাসের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

১

বাস্তবের সোজাসাপ্টা বর্ণনায় ইলিয়াসের যে অনায়াস দখল তার স্মরণীয় পরিচয় আছে ২৩ নম্বর পরিচ্ছেদে। শহীদ আসাদুজ্জামানের শোকসভা ডেকেছিল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ।

---

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে অফিসের লোকজন বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। সেক্রেটারিয়েট থেকে লোকজন দল বেঁধে বেরিয়ে এলে আর অফিসার-গোছের কেউ কেউ মিছিলে যোগ দিলে বোঝা যায় আন্দোলন নতুন মাত্রা পাচ্ছে। অবশ্য বাঁধভাঙা মানুষের জোয়ার এসবের অপেক্ষা না করেই 'এতো জনাকীর্ণ রাস্তাঘাট, এতো মিছিল, এই রাগী শহর' (আখতারুজ্জামান, ২০০৪ : ১৬৮) হয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে তোপখানা রোড, সচিবালয়ের গেট, আবদুল গণি রোডসহ গলি-উপগলিতে। আগুন লেগে যায় গুরুত্বপূর্ণ সরকারি স্থাপনায়, আইয়ুব খানের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আস্তানায়। ওসমান দেখে, দেখার চেষ্টা করে — মাঝে মাঝে কিছু মন্তব্য-মূল্যায়নও করে আপন মনে। তাতেই পাঠকের জন্য তৈরি হতে থাকে এক নিখুঁত সাংবাদিক বয়ান। ব্যক্তির চোখ দিয়ে কিন্তু ব্যক্তিকে মুখ্য না করে তৈরি হওয়া সে বয়ান নিরাসক্ত পক্ষপাতহীনতা অক্ষুণ্ন রেখে এক ধরনের দালিলিক মর্যাদা অর্জন করে।[১]

ইলিয়াসের এই বর্ণনা উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক বয়ানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ছাত্র-আন্দোলনের ইতিহাস-প্রণেতা মোহাম্মদ হাননান এ দিনের বিবরণে লিখেছেন:

> আসাদ নিহত হওয়ার খবর সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ার পর সঙ্গে সঙ্গে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয় ... অশ্রুভারাক্রান্ত অবস্থায় ছাত্রছাত্রীরা তাৎক্ষণিকভাবে এক শোকসভায় মিলিত হয়। ... শোকমিছিলের দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় দুই মাইল। ... ২১ জানুয়ারি ... পল্টন ময়দানে জনসভারও আয়োজন করা হয়েছিল। সেই জনসভায় ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে হাজার হাজার মানুষ আসাদের গায়েবানা জানাজায় অংশ নেয়। আসাদের রক্তমাখা শার্ট নিয়ে বিরাট-দীর্ঘ মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে। ২২ জানুয়ারি সন্ধ্যায় মশাল মিছিলে লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয়। (হাননান, ২০০৬ : ৩৭০-৭১)

আগের ও পরের দিনগুলোর যেসব ঐতিহাসিক বয়ান পাওয়া যায় (যেমন, হাননান, ২০০৬; জিবলু, ২০০৪; হাবিবুর, ১৯৯৮; মেসবাহ ও আরিফাতুল, ২০১১) তার অধিকাংশই *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে।[২]

কয়েকটি মৃত্যুর ঘটনা এই আন্দোলনকে বিশেষভাবে বেগবান করেছিল। এক হিসাবে দেখা যায়, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে ঢাকাসহ সারাদেশে অন্তত ৬১ জন নিহত হয়েছিল (হাননান, ২০০৬ : ৩৮০)। এর মধ্যে আসাদুজ্জামান ছাড়া অন্তত আরো দুটি মৃত্যুর ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য — ১৫ ফেব্রুয়ারি সার্জেন্ট জহুরুল হকের মৃত্যু আর ১৮ ফেব্রুয়ারি ড. শামসুজ্জোহার মৃত্যু (হাননান ২০০৬ : ৩৭৬-৭৭; জিবলু ২০০৪ : ১৫৫-৮৬; মেজবাহ ও আরিফাতুল ২০১১ : ১৮৫-৮৭)। *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসে এসব মৃত্যুর ঘটনা ঐতিহাসিক কালক্রম অক্ষুণ্ন রেখেই ব্যবহৃত হয়েছে। যাঁরা নিজ নামে গুরুত্বপূর্ণ আর যেসব মৃত্যু আন্দোলনের দৃশ্যমান গতি নিয়ন্ত্রণ করেছিল, তাঁদের বর্ণনা নৈর্ব্যক্তিকভাবেই দেয়া হয়েছে। ইলিয়াস বাড়তি মনোযোগ দিয়েছেন তাঁদের প্রতি যাঁরা নামত ইতিহাসে উল্লেখিত হননি, কিন্তু প্রবল সক্রিয়তায় আন্দোলনের সাফল্য নিশ্চিত করেছেন। হাড্ডি খিজির তাঁদেরই প্রতিনিধি।

মৃত্যু গণআন্দোলনের ক্ষেত্রে সবসময়েই গুরুত্বপূর্ণ — মৃতের আত্মত্যাগের বিচারেও, আন্দোলনের গতিপ্রকৃতির নিয়ন্ত্রক হিসাবেও। ইলিয়াস মৃত্যুকে মহিমান্বিত করেছেন, নিহত ব্যক্তিদের জন্য পর্যাপ্ত পরিসর বরাদ্দ করেছেন। প্রায়শই এ পরিসরের একাংশ ব্যয়িত হয়েছে আন্দোলনের সামগ্রিক বয়ানের অংশ হিসাবে, অন্য অংশে ঠাঁই পেয়েছে মৃতের ব্যক্তিগত পরিসর — পারিবারিক-সামাজিক প্রতিক্রিয়া। যেমন, রঞ্জুর ভাই তালেবের ক্ষেত্রে পারভেজের কাঁচা-বাংলায় পাওয়া যায় নিম্নোক্ত বর্ণনা : 'রাত্রে আমার ভাই বললো কে নীলক্ষেতে গুলি হয়েছে, আমার সিস্টারের হাজবেন্ড এসে বললো, হাতিরপুলের পাওয়ার স্টেশনের এক এমপ্লয়ির তো ডেথ হয়ে গেলো। আমি ইম্যাজিন করতে পারলাম না কে আমাদের তালেব —' (আখতারুজ্জামান, ২০০৪ : ২০)। এই বর্ণনা সামগ্রিক আন্দোলনের নির্বিশেষ পরিচয়। তালেবের ব্যক্তিগত পরিসরে বিশেষত পরিবারে তার মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া নিপুণভাবে দেখানো হয়েছে প্রায় পুরো উপন্যাস জুড়ে।

ঐতিহাসিক বাস্তবকে ঔপন্যাসিক-প্রতিবেদনে বদলে নেয়ার ক্ষেত্রে ইলিয়াস কয়েকটি কার্যকর কৌশলের আশ্রয় নেন। একদিকে পরিসরের বিপুলতা অন্যদিকে ব্যক্তির অন্তরঙ্গতা — এই দুই আলাদা দাবি সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পূরণের জন্য তাঁকে সতর্ক থাকতে হয়েছে। তাঁর এক কৌশল ব্যক্তি ও সমষ্টির ন্যায্য হিস্যা রক্ষা করা; আরেক কৌশল ভিতর আর বাইরের বাস্তবতাকে নিপুণ অনুপাতে বিন্যস্ত করা। ব্যক্তিগত কি সামষ্টিক, অন্তরঙ্গ কি বহিরঙ্গ — যে কোনো চিত্রায়ণেই তিনি ক্লান্তিহীন। তৃতীয় পরিচ্ছেদে ওসমানের অফিস যাওয়ার পথ ধরে স্ট্রাইকের পরিচ্ছন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। পুরান ঢাকার গলি-উপগলি-সমন্বিত ভূগোলের সাথে বিবরণগত আর রণকৌশলগত সমঝোতা রক্ষা করে গড়ে উঠেছে সে বয়ান। একথা এমনকি 'ঘন ঘাস রঙের হেলমেটের সঙ্গে ফিট করা পাঞ্জাবি, বালুচ ও বাঙালি সৈন্যদের' খোলা জিপটির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। গাড়িটি দাঁড়ায় ঠিক সেখানে যেখান থেকে কয়েকটি গলি ঠিকমতো কাভার করা যায়। আর পায়ে দলে পথ-চলা মানুষের থুথুতে সয়লাব রাস্তায় ক্রিকেট খেলুড়ে 'ছোট ছেলেরা' আর তাদের অনুচর নামহীন-গোত্রহীন 'বেওয়ারিশ পিচ্চি'রা খেলতে-খেলতেই বা ইতস্তত মিছিল করতে-করতেই নিপুণভাবে পিকেটিংয়ের কাজটি সারে — কখনো সাইকেল বা রিকশার হাওয়া ছেড়ে দিয়ে, কখনো-বা দোকান বন্ধ করতে বাধ্য করে। এরকম এক খবর নিয়ে আসে পিচ্চিদের একটা দল — 'লম্বু সালামের জিলাপির দুকান আছে না, অর বগলে সাইকেলের পাটসের দুকান আছে না, আছে না, ঐ বল্টু হালায় দুকান খুলছে।' (আখতারুজ্জামান, ২০০৪ : ২৮)

এরকমই করেন ইলিয়াস। নির্বিশেষ পরিচয়ের মোক্ষম এলাকায় মিশিয়ে দেন নির্ভেজাল বিশেষ বয়ান। তাতে ঐতিহাসিক সত্য আর ঔপন্যাসিক সত্যের নিখুঁত সমানুপাত তৈরি হয়। জমে ওঠে নির্জলা ব্যক্তিতার সঙ্গে সামষ্টিকতার সংঘাত, অন্তরঙ্গ অন্দরের সাথে কোলাহলময় সদরের মোলাকাত। পঁচিশ নম্বর পরিচ্ছেদে রিকশাওয়ালাদের মিছিল-মিটিং উপলক্ষে খুব অন্তরঙ্গ একটা ছবি তৈরির চেষ্টা করেছেন ইলিয়াস। তাতে কেন্দ্রের রাজনীতির সাথে মাঠের রাজনীতির সম্পর্কটা বেশ গুছিয়ে প্রকাশ করতে পেরেছেন।

রিকশাওয়ালারা প্রথম আসে আলাউদ্দিন মিয়ার গ্যারেজে। সকালে তারা রিকশা চালাতে চায়। আলাউদ্দিন মিয়ারও একই মত। খিজির কিন্তু রিকশা নিয়ে বেরোতে দিতে নারাজ। তার ধারণা, সকালে রিকশা বের করতে দিলে দুপুর দুইটার মিটিঙে লোক পাওয়া মুশকিল হবে। কিন্তু রিকশাওয়ালারা তার কথা মানে না; আলাউদ্দিন মিয়াও না। দুপুরে আলাউদ্দিন মিয়াকে ভাড়া উঠাতে দেখে সে একটু অবাকই হয়। তার ধারণা ছিল আজ ভাড়া দিতে হবে না। এই এলাকার প্রধান নেতা নগরকমিটির সম্ভাব্য সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদক আলাউদ্দিন মিয়াকে এভাবে লেখক আরেকবার চেনান। দুপুরে ঝামেলা হয় রহমতউল্লার গ্যারেজে রিকশা নিতে গেলে। সে রিকশা দেবে না। বজলুসহ কিছু লোক ঠিক করে রেখেছে রিকশাওয়ালাদের ঠেকানোর জন্য। ইলিয়াস এই দুই পক্ষের ঝগড়া আর মারামারিটা দেখান। কেন্দ্রের রাজনীতি পাড়ার দ্বন্দ্বে কিভাবে ভাষার জোগান দেয়, তাও স্পষ্ট করেন। পাজামা-পাঞ্জাবি-মাফলার পরা ইউনিয়ন লিডারকেও সাথে রাখেন। যোগ দেয় কিছু ছাত্রনেতাও। তাদের বক্তৃতা-বিবৃতি, তাদের ভাষা কিন্তু রিকশাওয়ালাদের স্পর্শ করে না। শেষ পর্যন্ত যে আন্দোলনকারী পক্ষের নিরঙ্কুশ বিজয় হয়, তার কারণ অনিয়ন্ত্রিত রিকশাওয়ালারাই। তারা রিকশা চায়। জোর-জবরদস্তি করে রিকশা নিয়ে বেরিয়ে যায়। রহমতউল্লার লোকদের সাথে মারপিট করে। গ্যারেজগুলো রিকশাশূন্য হতে থাকে। আলাউদ্দিন মিয়া এ পরিস্থিতিতে একেবারেই খুশি হতে পারে না। রিকশাওয়ালাদের নিবৃত্ত করতে সে যথাসম্ভব চেষ্টা করে। কিন্তু তার কথাও কেউ শোনে না। সে ছাত্রনেতা আর ইউনিয়ন লিডারদের বোঝাতে চেষ্টা করে: 'এদিককার বেশির ভাগ গ্যারেজের মালিক আমাগো মানুষ' (আখতারুজ্জামান, ২০০৪: ১৮৫)! রহমতউল্লা মহাজনকে সে একবার ধমকায় বটে, কিন্তু রিকশাওয়ালাদের রোষ থেকে বাঁচানোর চেষ্টাও করে।

২

এ ধরনের অন্তরঙ্গ চিত্রায়ণে ইলিয়াস শ্রেণিসাম্য আর শ্রেণিবিরোধের হিসাবটা সবসময়েই রক্ষা করেন। আপাত-বিরোধের মধ্যে গভীরতর যোগসাজস আর আপাত-সহাবস্থানের মধ্যে গভীরতর ফারাক ভুলে যান না; পাঠককেও ভুলতে দেন না। যেমন, মৌলিক গণতন্ত্রী রহমতউল্লা আর আওয়ামী লীগের উঠতি নেতা আলাউদ্দিনের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে এই মিঠেকড়া টানাপড়েন পুরো উপন্যাস জুড়েই রক্ষিত হয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে সমাজ ও রাষ্ট্রকে কাঠামোগত দিক থেকে উপলব্ধি করতে পারার ফলে। উৎপাদন-সম্পর্কের জড়ানো-প্যাঁচানো ধরন আর বিলি-বন্টনের জটিলতা সম্পর্কে বিস্ময়কর রকমের সচেতনতার ফলেই ইলিয়াস তাঁর বয়ানে রাষ্ট্রের মতো বড় পরিসরের সাথে ব্যক্তির মতো ছোট পরিসরকে অনায়াসেই সামঞ্জস্যপূর্ণ করে উপস্থাপন করতে পারেন। ফলে সদর-রাস্তার মিছিল-মিটিঙের সাথে *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসে ক্ষমতা-সম্পর্কের গোপন এলাকাগুলোও উন্মোচিত হতে থাকে; ব্যক্তির চাওয়া-পাওয়ার রং বদলাতে থাকে সামষ্টিক কর্মকাণ্ডের সাথে তাল রেখে; শহরের সাথে সাথে গ্রামও শরিক হয় সামগ্রিকতার অন্তঃসার নিয়ে।

এভাবে ইলিয়াস গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক সীমা বাড়িয়ে দেন অনেক দূর। যদিও মূল কাঠামো বা প্রতিষ্ঠিত তথ্যে বিশেষ ব্যত্যয় ঘটান না। আন্দোলনের নানা পক্ষ, সংশ্লিষ্ট দল বা শ্রেণি, ক্ষমতা-কাঠামোর প্রধান শরিকরা তাঁর বর্ণনায় যথাবিহিত স্থান পেতে থাকে। একটা কার্যকর ছবি আছে তালেবের মৃত্যুর পরের বর্ণনায় (আখতারুজ্জামান, ২০০৪ : ২০-২৫)। আন্দোলনের পক্ষ-বিপক্ষ, মৃত্যুকে আন্দোলনের গতিসঞ্চারে কাজে খাটানোর চেষ্টা, সরকারদলীয়দের নিয়ন্ত্রণ-চেষ্টা ইত্যাদির অন্তরঙ্গ পরিচয় নির্মিত হয় এই অংশে। 'এই মৃত্যুর ঘটনা আমাদের উদ্বেলিত করার জন্য নয়, ঢাকা শহরের বিভিন্ন শ্রেণী ও অংশের মধ্যে এই মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া থেকে বিভিন্ন চরিত্রের অবস্থান বুঝে নিতে এটি আমাদের সাহায্য করে।' (আনু, ১৩৯৯ : ১৫)

হোটেল আমজাদিয়ায় আনোয়ার আর আমজাদের তর্কে (আখতারুজ্জামান, ২০০৪ : ৩৪-৪২) উনসত্তরের আন্দোলনের দুই তাত্ত্বিক ধারা বেশ পষ্টভাবে উঠে এসেছে। রাজনৈতিক বিবেচনায় আনোয়ারের তীক্ষ্ণতা তাতে স্পষ্ট। কিন্তু গণআন্দোলনের চলমান রূপ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী আলতাফের কথাই জোরালো আর যৌক্তিক মনে হয়। টেবিলে তার সমর্থনও বেশি। রাজনৈতিক নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণ-অনিয়ন্ত্রণের বাইরে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের একটা মূর্তি — যা পরে নেতৃবৃন্দ নিজেদের মতো করে ব্যবহার করেন — এই তর্কে ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে।

একাদশ পরিচ্ছেদে লেখক আন্দোলনকে আরো স্পষ্ট করে আনেন। ভিক্টোরিয়া পার্কের সমাবেশে সর্বদলীয় মিটিং। তাই আন্দোলনে শরিক নানা পক্ষকে — অন্তত জাতীয়তাবাদী আর বামপন্থি অংশকে — মোটামুটি পষ্ট করে চেনা যায়। এখানেও ইলিয়াস স্থানটাকে চোখের সামনে ছবি আকারে ধরিয়ে দেন। সমবেত জনতার নানা ভাগ আর সামষ্টিক জটলাকে যথাসম্ভব মূর্তিমান করার চেষ্টা করেন। চেনা লোকগুলোকে মিটিঙের ভাঁজে ভাঁজে দাখিল করার ফাঁকে ফাঁকে নামহীন দুই বক্তার মূল কথাগুলো বক্তৃতার আকারে শুনিয়ে দেন। তাতে দুই ভিন্ন মত-পথের কথামালায় আমরা তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শও পরিষ্কার করে বুঝতে পারি। স্লোগান থেকেও অন্তত দুই গ্রুপের আলাদা অস্তিত্ব চেনা যায়। বামপন্থিরা স্লোগান দিচ্ছে 'দক্ষিণ দিকের গেটের পামগাছের নিচে'র জটলা থেকে; আর জাতীয়তাবাদীরা 'বেদীর নিচের' জটলা থেকে। এসব ফারাক অবশ্য একাকার হয়ে যাচ্ছে মাঝে-মধ্যেই — জালিম সরকারের দুঃশাসন আর পাকিস্তানি শোষণের বর্ণনায়-স্লোগানে। নামহীনভাবে আস্ত মিটিংটাকে এভাবে চিনিয়ে দেওয়ার পর লেখক চেনা এলাকায় প্রবেশ করেন। সেখানে আলাউদ্দিন মিয়া, আনোয়ার, ওসমান, আলতাফ, খিজির, মকবুল হোসেন মোটামুটি প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করে যায় (আখতারুজ্জামান, ২০০৪ : ৮৩-৮৭)।

নগরের মতো গ্রামীণ পরিসরও খুব নিপুণভাবে এঁকেছেন ইলিয়াস। শ্রেণি-পেশা থেকে শুরু করে দলীয় পরিচয় আর ক্ষমতা-কাঠামোর ভিতর-বাহির পর্যন্ত সবকিছু সেই সামগ্রিকতায় ধরা পড়েছে।[৩] মিছিল-মিটিঙের চাঞ্চল্য গ্রামে অতটা ছিল না। তাই

গণআন্দোলনের রূপটা এখানে অনেক বেশি পরিমাণে শোষক-শোষিতের বিরোধে রূপ নিয়েছে। আইয়ুব শাহির সমর্থক খয়বার গাজী আর তার ভাই-বেরাদর মিলে তৈরি হয়েছে শোষক উচ্চশ্রেণিটি। অন্য দলে আছে বিপুল কৃষক আর কৃষিশ্রমিক। গ্রামে আরো আছে জালাল মাস্টারের মতো শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, যার 'মানবিকতা' প্রায়শই নিজস্ব যুক্তিতেই ঝুঁকে পড়ে শোষকশ্রেণিটির দিকে। মাঝে-মধ্যে দেখা যায় কলেজছাত্রদের মিছিল-সমাবেশ, যারা তাদের নেতাদের মতো খুব স্বাভাবিকভাবে একাত্ম হয়ে যেতে পারে মৌলিক গণতন্ত্রী ভদ্রলোকদের সাথে। ইলিয়াস সাধারণভাবে কৃষক-শোষণ আর বিশেষভাবে গরুচুরির ঘটনাকে কেন্দ্রে রেখে *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসের গ্রামপর্ব সাজিয়েছেন।[৪] তাতে শুধু গ্রামীণ সমাজ-কাঠামোর পরিচয় নির্মিত হয়নি, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সাথে নগরের বহুমাত্রিক সম্পর্ক-বিচ্ছেদও চিহ্নিত হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে, গণঅভ্যুত্থানের সাথে যুক্ত নানা অংশের চিত্রায়ণে ইলিয়াস মোটামুটিভাবে বস্তুনিষ্ঠ থাকতে চেয়েছেন। অবশ্য তাঁর নির্বাচন, কাটছাঁট, গুরুত্বারোপ আর বর্জনও বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কিছু অংশকে তিনি পুরোপুরি বাদ দিয়েছেন।[৫] কোনো কোনো পক্ষকে প্রচলিত ইতিহাসের তুলনায় কম গুরুত্ব দিয়েছেন। যেমন, নেতৃবৃন্দের পরিবর্তে তাঁর বয়ানে গুরুত্ব পেয়েছে মাঠ-পর্যায়ের অনুঘটকরা। মাওলানা ভাসানী কার্যত অনুপস্থিত থেকে গেছেন। শেখ মুজিবুর রহমানের নাম যে কবার উচ্চারিত হয়েছে, তাতে তাঁর মহিমা প্রচারিত হয়নি। এর মধ্য দিয়ে কেবল ভিন্নধারার ইতিহাসই নির্মিত হয়নি, খোদ আন্দোলনটিই পুনঃসংজ্ঞায়িত হয়েছে। ওয়াসি আহমেদ যথার্থই লিখেছেন :

> আমজনতার মুখে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের আগ্রহ নেই — জনতার ভেতরে থেকেও মানুষ তার নিজস্ব আদলে, আচরণে, প্রকৃতিতে, লোভ-লালসায়, আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্নে তৈরি। দলিলকার হতে চাইলে ইলিয়াস জনতাকেই বেশি পছন্দ করতেন। 'চিলেকোঠার সেপাই' যে দলিল নয়, তার বড় প্রমাণ, এখানে গণআন্দোলনের সফল পরিণতির ছবি নেই — যা ইতিহাসে আছে। (ওয়াসি, ১৯৯৭ : ৬৭)

ইলিয়াস যে চরিত্রগুলোর প্রতি পক্ষপাত দেখিয়েছেন, ঘটনাপ্রবাহের যে অংশগুলোকে বিস্তারিত পরিসর দিয়েছেন, যেভাবে এ আন্দোলনের সম্ভাবনা আর সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করেছেন, তাতে দেখা যায়, গণমানুষের বিপুল অংশগ্রহণে যে বৈপ্লবিক রূপান্তরের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, মধ্যবিত্তের সংগঠনরূপে প্রভাবশালী পার্টিগুলো তার সুবিধা হাতিয়ে নিয়েছে মাত্র — সম্ভাবনাকে ফলবান হতে দেয়নি।

৩.১

গণআন্দোলনের যে অংশটা লেখকের অনুমোদন পেয়েছে, নাগরিক পরিসরে তার যথার্থ প্রতিনিধি নিঃসন্দেহে খিজির। খিজির একেবারে শুরু থেকেই 'চার্জড'। সক্রিয় এবং উত্তেজিত। তালেবের মৃত্যুর সময়ে তাকে প্রথম দেখা যায় লোবান জ্বালাচ্ছে। পঞ্চম পরিচ্ছেদে দেখা যায়, 'খিজির বহুত চার্জড হয়ে ইটা মারছে' (আখতারুজ্জামান, ২০০৪ : ৪৪)। খিজির তার ব্যক্তিগত ইতিহাসসহ লম্বা জায়গা জুড়ে মূর্তি পেয়েছে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

থেকে শুরু করে পরের কয়েক পরিচ্ছেদ জুড়ে। অবশ্য তার ব্যক্তিগত ইতিহাস সামষ্টিক ইতিহাসের সমান্তরালে বা অধীনে বর্ণিত। রহমতউল্লা মহাজন আর তার ভাগনে আলাউদ্দিন মিয়ার বগল ঘেঁষে, তাদের আয়-উপার্জন আর শারীরিক-মানসিক প্রবৃত্তিগত সক্রিয়তার সাথে জড়িয়ে-পেঁচিয়ে খিজির বিশিষ্ট হয়ে ওঠার পরিসর পায়। লেখক তাকে বেশ খানিকটা পরিসর ছেড়ে দেন — তাতে আলবত পক্ষপাত আছে; কিন্তু এক ফোঁটা আবেগ নেই। আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাঠামোর মধ্যে তার অবস্থান একবিন্দুও মহিমান্বিত হয় না।

ইদের নামাজের সময়টাতে খিজিরকে গ্যারেজের নিরিবিলিতে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে লেখক খোয়াবের মতো করে পাঠকদের ঘুরিয়ে আনেন খিজিরের অতীত থেকে। পৃষ্ঠা তিনেকের বর্ণনায় একেবারে অতল-ভ্রমণ। মধ্যবিত্ত-জীবনের সমস্ত বৈচিত্র্য একত্র করলেও একে ভূতুড়ে বর্ণনা বলে মনে হবে। এক ভূতের কারসাজিতেই খিজির ঘুমিয়ে পড়েছিল অবেলায়। ঘুমের মধ্যেই মাকে দ্যাখে, মায়ের ভাতারকে দ্যাখে, হাতবদল হয়ে যায় বার-কয়েক; নতুন নতুন পেশার আমোদ পেতে থাকে, আশ্রয় পাওয়ার আর হারানোর বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে, কিল-গুতা-আমোদ-বিনোদনের ঝকমারিতে হয়ে উঠতে থাকে আজকের লম্বু হাড্ডি খিজির।

মায়ের যে স্মৃতি খিজির অস্পষ্ট রূপরেখায় আজো বহন করে চলছে, তা কেবল কারো মনে অনির্দিষ্ট-অনির্দেশ্য ক্রোধই তৈরি করতে পারে। 'খিজিরের মা মাগি', যে আজো খিজিরের ভাড়াটে ঘরে 'ছিনালীপনা করতে' আসে, তাকে যথাবিহিত সম্বোধন করার কায়দা-কানুন তার জানা নাই। কিন্তু রক্তাক্ত শরীর নিয়ে, মহাজন-কথিত 'খারাপ মাইয়া মানুষ'টা তো আসে। আসে খিজিরের জন্ম আর বেড়ে ওঠার বিত্তান্তটা আরেকবার মনে করিয়ে দিতে। নিজের আর মায়ের হীন-কুচ্ছিত জীবনটার দায়িত্ব নিয়ে কুঁকড়ে থাকার সৌজন্যও তার নাই। অপরিমেয় এসব দায়-দেনা খিজির যদি বেহিসাবি একটা অবিমৃশ্যকারিতায় শেষ করে দিতে চায় — শেষ করে দেয় — তাহলে তার নিজের দিক থেকে তা খুব অযৌক্তিক হয় না।

হয়ত যথেষ্ট নয়, কিন্তু খিজিরের এই অতীতের মধ্যেই বেড়ে উঠতে থাকে গণআন্দোলনের এক ডরভয়হীন অপরিণামদর্শী সৈনিক।

আগে-পরেও আছে, কিন্তু দশম পরিচ্ছেদেই পরিষ্কার বোঝা যায়, মহাজনের প্রতি পুষে রাখা ঘৃণা আর ক্ষোভই খিজিরের মূল প্রেরণা। সমবেত জনতাকে মহাজনের বিরুদ্ধে উস্কে দেবার সমস্ত চেষ্টাই সে চালিয়ে যায়। আলাউদ্দিন মিয়ার ধমক খেয়েও। মহাজন যে রঞ্জুর বাপকে হুমকি দিয়েছে, নানাভাবে নাজেহাল করেছে, এমনকি আলাউদ্দিন মিয়া না ঠেকালে 'মনে লয় দুইচাইরখান চটকানা ভি মাইরা দিতো', এ সংবাদ খিজিরের পুনরাবৃত্তিতেই সবার কানে যায়। মিছিলে মহাজনের বিরুদ্ধে ধুয়া ধরে ওই খিজিরই (আখতারুজ্জামান, ২০০৪ : ৮১-৮৩)।

দেখা যাচ্ছে, গণআন্দোলনে খিজিরদের জান-বাজি-রাখা ভূমিকার মূলে আছে তাদের শ্রেণি-বাস্তবতা। যার হারানোর কিছু নাই, তার পক্ষেই সম্ভব জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নেমে

পড়া। এ আন্দোলনে মধ্যবিত্তের একটা অংশও জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিল। তারা তা করেছিল প্রধানত পার্টি-রাজনীতির ছত্রছায়ায়। বিদ্যমান ক্ষমতা-কাঠামোয় নিজেদের 'অপরতা' ঘুচিয়ে পরিবর্তিত ক্ষমতা-কাঠামোর অংশীদার হওয়ার সম্ভাবনা তাদের ছিল। যার ছিল না, সেই ওসমানের সাথে খিজিরের পারস্পরিকতা-বিরোধ-সমঝোতার লম্বা ছবি আছে *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসে। এই ছবিতে খিজিরদের চেনা গেছে আরো পরিষ্কার করে, উন্মোচিত হয়েছে ওসমানদের সামগ্রিক চেহারাও।

খিজির-ওসমানের একটা তাৎপর্যপূর্ণ দ্বৈরথ তৈরি হয় ২৩ নম্বর পরিচ্ছেদের শহীদ আসাদ দিবসের সমাগমে। ওসমান পুরো সময়টাতে মিছিলের সাথেই ছিল। বারবার সে সক্রিয় হতে চেয়েছে। কিন্তু কিছু করে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। সন্ধ্যার পর নবাবপুর রোডের ইলেকট্রিসিটিহীন অন্ধকারে প্রজ্বলিত আগুনের শিখার মধ্যে ওসমান খিজিরের 'ভাঙাচোরা গাল' দেখতে পায়। তার এক হাতে প্লায়ার, অন্যহাতটি যথারীতি ওপরে তুলে ধরা। 'এখান থেকে তার ভাঙা গালের উঁচু হাড়গুলো আগুনের আভায় লাল দেখাচ্ছে, তাকে হঠাৎ খুব বিশিষ্ট বলে মনে হয়' (আখতারুজ্জামান, ২০০৪ : ১৬৫)। ওসমানের এমন মনে হওয়ার কারণ আসলে খিজিরের সক্রিয়তা — 'মনে হয়, আগুন ধরিয়ে দিয়েছে সে-ই'। একটু পরে কারফ্যু ঘোষিত হলে ওসমান খিজিরকে দ্রুত যেতে তাগাদা দেয়। খিজির আপত্তি করে না। লেখকের মূল্যায়ন : 'খিজির ভয় পেয়েছে ভেবে ওসমান স্বস্তি পায়, ওসমানের পদক্ষেপ তাই বেশ দৃপ্ত' (আখতারুজ্জামান, ২০০৪ : ১৬৫)। কিন্তু এই প্রতিতুলনায় ওসমানের জয়ী হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না শেষ পর্যন্ত। প্রকৃতিগতভাবে দুজন আলাদা। কিন্তু আলাদা হয়েও দুজন গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে বা পারত। তা হয় না। খিজিরই জিতে যায়। কিভাবে? একটু পরেই বিবিসি রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে তাদের দেখা হয় সিনেমার কৌতুকাভিনেতা 'ফ্যাটি সোহরাবে'র সাথে। লোকটা একে বেশুমার মোটা; তাই মাতাল আর আহত। বিশ্রস্ত অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল দেয়াল ধরে। খিজির তাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা শুরু করে। আধাখেঁচড়া উর্দুতে বাতচিত করে, আর উর্দু ছবির সংলাপ আওড়ায় সাড়ম্বরে। ওসমান তো বেওকুফ বনে যায়। একদিকে লোকটার যা-তা অবস্থা; তদুপরি কারফ্যুর আর দেরি নাই। সে ভাবে : 'লোকটার কি কিছুমাত্র বিবেচনা বোধ নাই? একটু আগেই না এর রাগী ও ভাঙাচোরা গাল গরম লোহার মতো ভয়ানক দেখাচ্ছিল! অথচ কিছুক্ষণ যেতে না যেতে একি তামাশা?' (আখতারুজ্জামান, ২০০৪ : ১৬৭)

নৈতিকতার বাঁধা মানদণ্ডে ওসমান আরেকবার খিজিরকে পরাস্ত করতে চায়। কিন্তু বৃথা। ঠাট্টা-তামাশা শেষে খিজির ওসমানকে চলে যেতে বলে। সে যাবে ফ্যাটি সোহরাবকে পৌঁছে দিতে। কারফ্যু তখন প্রায় শুরু হয়ে গেছে। ওসমান কালবিলম্ব না করে রওয়ানা হয়ে যায়। পর্বতপ্রমাণ মৃত্যুভয় নিয়ে বারবার রাস্তা বদল করে সে শেষ পর্যন্ত প্রায় ঘোরের মধ্যে বাসায় পৌঁছায়। একটু পরেই তার জন্য অপেক্ষা করবে রানুর উদ্বেগ আর আপ্যায়ন। সে রসিয়ে শোনাবে সারাদিনের রোমাঞ্চকর সব গল্প। আর রানুর স্পর্শলাভের কাতরতায় অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থেকে ঘুমের অতলে তলিয়ে যাবে শেষ রাত্তিরে।

না। ওসমানের প্রতি লেখকের একটুও বিরূপতা প্রকাশ পায়নি এখানে। যা যেভাবে ঘটার সেভাবেই ঘটে। ওসমান এই গণআন্দোলনের ঘোরতর সমর্থক। ভালো কর্মী হয়ে উঠতে তার আপ্রাণ চেষ্টাও বেশ টের পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে এই মহিমান্বিত মৃত্যু সে নিজের জন্যও কামনা করে। আবার মৃত্যু এড়ানোর জন্য মরণপণ চেষ্টাও করে — 'এতো জনাকীর্ণ রাস্তাঘাট, এতো মিছিল, এইরাগী শহর' — এসব ছেড়ে সে মরতে চায়ও না। সবই ঠিক আছে। তাহলে তার সমস্যা তো জন্মসূত্রে পাওয়া সমস্যা। মধ্যবিত্তের গা-বাঁচানো স্বভাব, কর্মী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রকৃতিগত বাধা, নৈতিকতার ছকবাঁধা গণ্ডিতে অভ্যস্ত জীবন — এইসব হুবহু কাজ করতে দেখি ওসমানের চরিত্রে। কিংবা এমনও হতে পারে : ওসমানের আচরণে, কায়কারবারে, মধ্যবিত্তের শ্রেণিগত সমস্যাগুলোই চিহ্নিত হতে থাকে উপন্যাসজুড়ে।

মধ্যবিত্তের যে অংশ উৎপাদন-বন্টন আর ক্ষমতা-কাঠামোয় সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে ছিল, তার ছবিও ইলিয়াস সবিস্তার বর্ণনা করেছেন। উল্লেখ্য, এ উপন্যাসে পুঁজিপতিশ্রেণির ভূমিকা পুরোপুরি গরহাজির। অথচ গণঅভ্যুত্থানের সামগ্রিক রূপই তিনি দেখাতে চেয়েছেন। এ থেকে মনে হয়, উনসত্তরের আন্দোলনে বৃহৎ পুঁজির অন্তত নিয়ন্ত্রক ভূমিকা ছিল না — এ-ই ছিল তাঁর সিদ্ধান্ত। এ উপন্যাসে শিল্পশ্রমিকের অনুপস্থিতির সাথে তাঁর এই সিদ্ধান্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। রিকশা ও স্কুটার-গ্যারেজের মালিক, বাণিজ্যিক ভূমির দখলিস্বত্ব, কন্ট্রাকটরি — ইত্যাদি যেসব আর্থিক কায়কারবারে রাষ্ট্রক্ষমতার প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা দরকার হয়, সেগুলোকেই তিনি কেন্দ্রে রেখেছেন। অস্তিত্বের প্রয়োজনেই এই শ্রেণির মানুষেরা কেন্দ্রীয় ক্ষমতা-কাঠামোর সাথে সরাসরি যুক্ত। রহমতউল্লা মহাজন আর আলাউদ্দিন মিয়া এই শ্রেণির প্রতিনিধি।

'মামাভাগ্নের গ্যারেজ ২টো পাশাপাশি।' — পাশাপাশি এ দুই গ্যারেজের মতো ইলিয়াস সমান্তরালেই এঁকে যান এ দুই ক্ষমতাধর ব্যক্তির ছবি। উৎপাদন-ব্যবস্থায় সুবিধাজনক অবস্থানে থাকা এ দুজন প্রায় গণিতের মতো নিশ্চিত হিসাবে অংশ নেয় ক্ষমতা-সম্পর্কের যথাক্রমে বিদ্যমান ও সম্ভাব্য ব্যাকরণে। ইলিয়াস তাদের পারস্পরিকতা দেখান — সম্পত্তির মালিক হওয়া থেকে শুরু করে সম্পত্তি রক্ষা করা পর্যন্ত অনেক কায়কারবারে তাদের মিলঝিলও পরিষ্কার করে বলেন। বিদ্যমান ক্ষমতার অংশভাগী রহমতউল্লা আর নতুন রাজনীতি তথা গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে নতুনভাবে ক্ষমতাবান হতে থাকা আলাউদ্দিন যে আদতে একই শ্রেণি-উৎসের জাতক, আর সম্পত্তিরক্ষার ক্ষেত্রে তারা যে পরস্পরের পৃষ্ঠপোষক, তা দেখানোয় এক বিন্দু ফাঁক রাখেন না ইলিয়াস। তার মানে আবার এই নয় যে, একই রঙ-তুলির একই ধারার পোঁচে দুজনকে এঁকে ফেলা যাবে। লেখক অভেদটা যেমন মজবুত করে আঁকেন, ভেদটাও তেমনি পরিচ্ছন্ন করে দেখিয়ে দেন। ফারাকটা মূলত রুচির। সম্পত্তি-ব্যবস্থাপনার কায়দায়, অধীন কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণের ধরনে, ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার নতুনতায় আর ক্ষমতা-সম্পর্কের নতুন ব্যাকরণের অংশীদার হিসাবে আলাউদ্দিন মিয়া প্রায় উঠতি-বুর্জোয়ার সম্মান পেয়ে যায়। অন্যদিকে,

'সামন্ত' কথাটাকে একটু শিথিল অর্থে ব্যবহার করলে বলা যায়, রহমতউল্লা প্রায় সামন্ত মূল্যবোধ-আচরণের মানুষ। তার উচ্চারণ-আচরণ থেকে শুরু করে পরিবারের গড়ন পর্যন্ত কোথাও স্বস্তির দম ফেলার অবকাশ পাওয়া যায় না। সামন্ত মূল্যবোধের মধ্যে সম্প্রীতি ও করুণার মতো যে ব্যাপারগুলো গল্প-আকারে হলেও জাহির আছে, রহমতউল্লার মধ্যে তার কানাকড়িও মেলে না। যেমন, ইদের দিন সকালটা ঘুমিয়ে কাটানোর পর খিজিরের প্রতি আলাউদ্দিনের স্নেহমাখা প্রশ্রয়ের বিপরীতে রহমতউল্লার উক্তি : 'এ্যাগো আবার নামাজ! ঈমান নাই, এ্যাগো আল্লা-রসুলের ডর আছে?' (আখতারুজ্জামান, ২০০৪ : ৫৫)

এখানে ইলিয়াস খানিকটা পক্ষপাত করেছেন। আইয়ুব শাহির আমল আর তার স্থানীয় দোসরদের সম্পর্কে বাজারে চালু ধারণাগুলো মান্য করেছেন। অবশ্য পক্ষপাতটা তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও শিক্ষার ফলও হতে পারে। পাকিস্তান-আন্দোলনের সৈন্যসামন্তদের বিপরীতে নব্যশিক্ষিত ও নব্যনাগরিক জনগোষ্ঠীকে 'আধুনিক' অভিধায় চিহ্নিত করার একটা রেওয়াজ ঢাকায় মোটামুটি সর্ববাদীসম্মতি পেয়েছে। এতে ইলিয়াসের সায় থাকাই সম্ভব। সরল করে হয়ত এই ফারাককে পুরান ঢাকা আর নতুন ঢাকার প্রতীকে প্রকাশ করা যায়। আলাউদ্দিন মিয়া যে ইদের নামাজ পড়তে যেতে চায় বায়তুল মোকাররমে, মিলবার চায় 'বহুত মানুষের লগে', আর রহমতউল্লা যে যেতে চায় পুলের উপরের মসজিদে, যেখানে 'বাপ দাদা ময় মুরুব্বি চোদ্দ পুরুষ নামাজ পড়ছে', তাতে দুজনের দৃষ্টিভঙ্গির ফারাকটাই তো ফুটে ওঠে। কিন্তু এ পর্যন্তই। আবেগে বিগলিত হওয়ার ব্যাপারটা ইলিয়াসে একেবারেই নেই। তিনি এমনকি আলাউদ্দিনকেও একবিন্দু ছাড় দেন না। ধনবান মামার একমাত্র মেয়েকে কব্জা করার জন্য আলাউদ্দিন সাহেব যেসব সূক্ষ্ম চাল চালেন, তার ফিরিস্তি সূক্ষ্মভাবেই আঁকেন; অসংখ্য উচ্চারণে, আচরণে, ফন্দিতে, শেষে কায়কারবারে পরিষ্কার করে দেখিয়ে দেন, রুচির ফারাক শেষ পর্যন্ত শ্রেণির ঐক্যে চিড় ধরাতে পারে না।

*চিলেকোঠার সেপাই*য়ে মার্কসবাদী ইলিয়াসের ইতিহাসবোধ বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের একটা স্বাভাবিক কিন্তু স্বল্প-উচ্চারিত সত্য সামনে নিয়ে আসে — চেতনাগত ফারাক যেমনই হোক, শ্রেণিচরিত্রে পুরোনো আর নতুন জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে ফারাক নাই; উৎপাদন-সম্পর্কে আধিপত্য হাসিল করা, শোষণকে বৈধ করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রক্ষমতাকে ব্যবহার আর শ্রেণিঘৃণায় তারা রসুনের গোড়ার মতো এক। নতুন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অনিবার্যতা তিনি মানেন; একে হয়ত ইতিহাসের দিক থেকে 'অগ্রগতি'ও মনে করেন; কিন্তু সম্পর্কের বৈপ্লবিক রূপান্তর যাঁর বাসনা, তাঁর কাছে এ 'অগ্রগতি' ন্যূনতম মনে হওয়াই স্বাভাবিক। ইলিয়াসের সমসাময়িক লেখক আহমদ ছফা *ওঙ্কার* প্রভৃতি উপন্যাসে পাকিস্তান-বিরোধী আন্দোলন-সংগ্রাম আর বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের এই শ্রেণি-বৈশিষ্ট্যটি আভাসে-ইশারায় দেখিয়েছেন। *আহমদ ছফা সঞ্জীবনী* গ্রন্থভুক্ত কিছু প্রবন্ধে সলিমুল্লাহ খান তা বিশদ করেছেন।[৬] দুই ঔপন্যাসিকের ফারাক এই যে, ছফা কথাটা ইঙ্গিতে বলেছেন; আর ইলিয়াস বিস্তারিত দেখিয়েছেন।

৩.২

শহরের মতো গ্রামের প্রেক্ষাপটেও উৎপাদন-সম্পর্ক আর ক্ষমতা-সম্পর্কের নিশ্ছিদ্র বাস্তবতায় গণআন্দোলন উপস্থাপিত হয়েছে।[৭] সেখানে খিজিরের সমান্তরাল চরিত্র হিসাবে চেংটু-করমালিকে সহজেই শনাক্ত করা যায়। জালাল মাস্টারের বাড়িতে রাত্রে খেয়ে ফেরার পথে আনোয়ারকে এগিয়ে দিতে আসে চেংটু। অন্ধকার পথে যেতে যেতে চেংটুকে খানিকটা পরিচিত করিয়ে দেওয়ার ফুরসত করে নেন লেখক। তাতে দেখা যায়, খিজিরের সাথে চেংটুদের একটা গোড়ার ফারাক আছে। তারা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত। আলীবক্সের চেলা। কে এই আলিবক্স? চেংটু জানায়, সে মাদারগঞ্জ 'কলেজত' পড়ে। ডাকাত-মারা চর থেকে চুরি-যাওয়া গরু উদ্ধারের একটা চেষ্টা সে করেছিল। পারেনি। চেংটুর ভাষায় : 'খয়বার গাজীর মানুষ মেলা, হাতিয়ারও মেলা। আলিবক্স ভাই কুলাবার পারে নাই, নাও নিয়া আবার সর‍্যা গেছে' (আখতারুজ্জামান, ২০০৪ : ১২২)। পরে চেংটু বিচারসভার কথা বলে। কার কী অপরাধ — সে সম্পর্কে তার ধারণা খুব পষ্ট। খয়বার গাজী তো আছেই। সাথে তার ভাইয়ের বেটা আফসার — 'আফসার শালা আছে খালি মাগীমানষের পাছাত, চাষাভুষার ঘরত এ্যানা সুন্দর মাগীমানুষ দেখলে তাঁই খালি ফাল পাড়ে' (আখতারুজ্জামান, ২০০৪ : ১২২)।[৮] আর আছে মিয়াবাড়ির 'অশিদুল', ফকিরবাড়ির ফরিদ। রশিদুল বর্গাচাষীদের সাথে ঝামেলা পাকায়। ইত্যাদি।

গ্রামে অবস্থাপন্ন লোক যে খুবই সামান্য ক ঘর, সে ব্যাপারে চেংটু সচেতন। তার চরিত্রের জোরও প্রকাশ করে সে নিঃসংকোচে : 'হামি মিছা কথা কই না ভাইজান!' — সে আনোয়ারকে বলে। নিজের 'প্রলেতারিয়েত' অবস্থা সম্পর্কেও সে খুব হুঁশিয়ার। তার ভাষ্য : 'সোগলির বিপদ হবো কিসক? হামাগোরে আবার বিপদ কি? হামাগোরে জমি নাই, জিরাত নাই, ঘর নাই, ভিটা নাই, ধান নাই, মরিচ নাই, — বিপদ বিসম্বাদ হলে হামাগোরে নোকসান কি?' (আখতারুজ্জামান, ২০০৪ : ১২৫)

এ রকম আরেক চরিত্র করমালি। করমালির সাথে চেংটুর অনেক দিক থেকে বেশ মিল আছে। তার বাপও জালাল মাস্টারের বর্গাদার ছিল। সেও নানা অজুহাতে ফসলের ভাগ কম দিতে চাইত। কিন্তু জালাল মাস্টারের ভাষায়, তার সুর ছিল নরম। ফসল কম দেওয়ার ক্ষতি সে তার কাকুতি-মিনতি দিয়ে, বিনয় দিয়ে পুষিয়ে দিত। কিন্তু করমালির রকম-সকম আলাদা। সে ফসল কম দিলে মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে কম দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে। চেংটু ও করমালির এই স্বভাব ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে যে, এরা নতুন প্রজন্মের মানুষ। সে পরিচয়টা শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ন থাকে যখন করমালি ঢাকায় আনোয়ারের কাছে আসে। আনোয়ারের সঙ্গে তুলনায় লেখক যেন করমালির মধ্যেই যথার্থ রাজনৈতিক কর্মীর যাবতীয় বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করে দেন। অশিক্ষা, কুসংস্কার আর অপরিণামদর্শিতা সত্ত্বেও সে শ্রেণিশত্রু সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞানে প্রজ্ঞাবান। ঢাকায় চাকরি করে নিজের ব্যক্তিগত মুক্তির সম্ভাবনা সে স্বাভাবিকভাবেই উড়িয়ে দেয় (আখতারুজ্জামান, ২০০৪ : ৩১১)।

জালাল মাস্টার দুই নৌকায় পা দেয়া গ্রামীণ শিক্ষিত সমাজের প্রতিনিধি। সে চেংটুকে থাকার জায়গা দেয়, আবার খয়বার গাজীর মানসম্মান নিয়েও তার উদ্বেগের শেষ নাই। করমালির গরুচুরি গেলে সে তাকে জমি বর্গা দেওয়ার ব্যাপারে সীমাহীন দ্বিধার মধ্যে পড়ে। করমালিকে সে না করতে পারে না মানবিক বিবেচনাবশত। অবশ্য শেষ পর্যন্ত মধ্যবিত্তের দ্বিধাই তার চরিত্রে বেশি করে প্রমাণিত হয়। আলিবক্সের পরিকল্পনা-মোতাবেক চেংটু-করমালিরা ধারাবর্ষা চরে যাওয়ার উদ্যোগ নিলে জালালউদ্দিন ভয় পায়: 'এই মূর্খদের কাণ্ডজ্ঞানের বড় অভাব। হোসেন ফকিরের গায়ে হাত তোলার পরিণতি কি হতে পারে এরা কি আন্দাজ করতে পারছে' (আখতারুজ্জামান, ২০০৪ : ২১২-১৩)? ডাকাত-মারার চরে আক্রমণের সংবাদ পেয়েও সে উদ্বিগ্ন হয়। আনোয়ারকে বলে : 'সমাচার খুব খারাপ। ডাকাত-মারার চরের বাথান শুনলাম লুটপাট হছে। হোসেন আলির বাড়িত নাকি আগুন ধরায়া দিছে। কও তো বাপু, এটা কি মনুষ্যত্ব' (আখতারুজ্জামান, ২০০৪ : ২১৫)? জালাল মাস্টারের মধ্যে ইলিয়াস উদারনৈতিক মানবতাবাদীদের প্রকৃতি আর সীমাবদ্ধতাই হয়ত চিহ্নিত করতে চেয়েছেন।

সতের নম্বর পরিচ্ছেদের যাত্রা-প্যান্ডেলে ইলিয়াস শ্রেণি-বিভক্ত গ্রামীণ সমাজের একটা চিত্র আঁকেন। আফসার গাজীর মাতলামির প্রতিবাদ প্রথম ছোটলোকদের সারি থেকেই এসেছে। ক্রমে তার সাথে চেয়ারে বসা ভদ্রলোকরাও যোগ দেয়। কিন্তু পেছনের আমজনতা একত্রে প্রতিবাদী চেঁচামেচি শুরু করলে 'চেয়ারে উপবিষ্ট দর্শকরা উসখুস করে এবং হঠাৎ চুপ করে যায়। পেছনের কোলাহল অব্যাহত থাকে' (আখতারুজ্জামান, ২০০৪ : ১২৯)। এই ছবি পুরোপুরি বাস্তবসম্মত কিনা সে প্রশ্ন আলবত তোলা যায়। কিন্তু ইলিয়াস যে ভদ্রলোকদের পারস্পরিক সমঝোতার একটা ছবি আঁকতে চেয়েছেন তাতে কোনো সন্দেহ নাই।

এই সমঝোতার ছবিটা সবচেয়ে প্রবল হয়েছে আনোয়ারের ক্ষেত্রে। তার বাবার বরাত দিয়ে তার সাথে এক ধরনের আত্মীয়তা পাতাতে চায় সবাই — খয়বার গাজী, জালাল মাস্টার, আফসার গাজী এমনকি হোসেন আলি পর্যন্ত। হয়ত এটা অস্বাভাবিক নয়। কারণ, তাদের সাথে তো আনোয়ারের আত্মীয়তা আছেই। কিন্তু আনোয়ার নিম্নবিত্তের মানুষের সাথে কাজ করে। এই সংবাদ এদের সকলেরই জানা। তাই বাপের অতীত ইতিবৃত্ত মনে করিয়ে দিয়ে তাকে দলে টানতে চাওয়া এদের সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক। আর ইলিয়াস বারবার দেখিয়েছেন, এই চাওয়াটা কাজও করে। এমনকি দুর্ধর্ষ হোসেন আলির ক্ষেত্রেও। এ থেকে বোঝা যায়, ইলিয়াস শ্রেণিপ্রশ্নে একটা পরীক্ষা চালানোর ব্যাপার সবসময়েই মাথায় রেখেছেন।

হোসেন আলি যে কতটা ভয়ংকর আর অন্যায্য, তা আনোয়ারের নিজ চোখে দেখা। ধারাবর্ষা চরে হোসেন আলিদের লুট করা গরু দেখেছে, সে গরু ফিরিয়ে দিয়ে বিপুল টাকা লুটে নিতে দেখেছে। আরো দেখেছে আলিবক্সকে খুন করার মরিয়া চেষ্টা। এরকম জঘন্য এক লোকের অতিথি সে হয়েছে কেবল আত্মীয়তার সূত্রেই। কিছুই সে করতে পারেনি। হোসেন আলি টাকা ঠিকই আদায় করেছে। তার হয়েছে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতা

হওয়ার পর একবার হোসেন আলি আনোয়ারের বাবার কথা তোলে। যৌবনে তার বাবা এই চরে রিলিফ দিতে এসেছিল। হোসেন তার সাথে ছিল। ইত্যাদি। এরপরের বাক্যটি তাৎপর্যপূর্ণ : 'মনোযোগ দিয়ে এইসব শুনতে শুনতে হোসেন আলির ওপর বিরাগে একটু নরম প্রলেপ পড়ে'। (আখতারুজ্জামান, ২০০৪ : ২০৫)

না। আনোয়ার তার অবস্থান পাল্টায় নাই। রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত পক্ষপাতে গরিব মানুষদের প্রতি তার সমর্থন অক্ষুণ্ণই থেকেছে। কিন্তু তার কারণেই যখন শেষ পর্যন্ত খয়বার গাজী নিজেকে বাঁচিয়ে ফেলতে সমর্থ হয়, তার কোনো ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও যখন তার কারণেই ঘটনাটা ঘটে, তখন এর দুটি তাৎপর্য সম্পর্কে হুঁশিয়ার না হয়ে পারা যায় না। এক. শ্রেণির ব্যাপারটা শুধু জ্ঞান, রাজনীতি বা সহানুভূতি দিয়ে অতিক্রম করা যায় না। ব্যাপারটা আরো গভীর। দুই. কার্যকর শ্রেণি-রাজনীতির জন্য কেবল জ্ঞান আর সদিচ্ছাই যথেষ্ট নয়। দরকার নিবিড় অভিজ্ঞতা — বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে একত্রে বসবাস ছাড়া সেই অভিজ্ঞতা অর্জন সম্ভব নয়। খয়বার গাজীর পলায়নে আনোয়ারের প্রত্যক্ষ ভূমিকায় দুই দিকই পষ্ট হয়েছে। তবে শেষেরটি খুব পরিষ্কারভাবে বোঝানোর জন্যই ইলিয়াস আলিবক্স চরিত্রটিকে যত্ন করে তৈরি করেছেন।

৩৯ নম্বর পরিচ্ছেদে খয়বার গাজীর পলায়ন আর জাতীয়তাবাদীদের সাথে মৌলিক গণতন্ত্রীদের সমঝোতার প্রেক্ষাপটে কয়েকটি মূল্যায়ন হাজির করেছেন লেখক। নিম্নশ্রেণির মানুষের সাথে মিলে নিজ শ্রেণির আত্মীয়দের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য বড়চাচা আনোয়ারের ওপর ক্ষুব্ধ হয়। জালাল মাস্টার বলতে চায়, আনোয়ারের কারণেই গাজী এ যাত্রা রক্ষা পেয়েছে। আনোয়ার এ ধরনের যে কোনো প্রপাগান্ডার ঘোরতর বিরোধী। স্পষ্টত সে গাজীর শাস্তিই চেয়েছিল। কিন্তু তার কারণেই সে পার পেয়ে গেল। নবেজউদ্দিনের মারফত চেংটুর মূল্যায়ন শুনতে পায় আনোয়ার : 'ভাইজান নরম দিলের মানুষ, সোজা মানুষ, খয়বারের শয়তানী আপনে বুঝব্যার পারেন নাই। নামাজের অছিলা করয়া তাঁই পার পায়া গেলো।' (আখতারুজ্জামান, ২০০৪ : ২৮৬)

এসব মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে ইলিয়াস আসলে গণআন্দোলন, বিপ্লবী রাজনীতি আর সুবিধাবাদী জাতীয়তাবাদী রাজনীতির গভীর তত্ত্বায়নের সুযোগ করে নেন।

৩.৩

আসলে পার্টি-রাজনীতি আর বিপ্লবী রাজনীতির প্রতিষ্ঠিত ছকের বাইরে গণআন্দোলনের বিশেষ সংজ্ঞায়ন এবং তত্ত্বায়নই *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসকে আরোপিত তত্ত্বের গোলামি থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতায় বিপ্লবী রূপান্তরের সম্ভাবনা দেখানো হয়েছে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে। কিন্তু সে সম্ভাবনার অসফল পরিণতির কারণগুলোও ওই বাস্তবতার মধ্যেই ছিল। খিজির বা চেংটুর মতো বিপ্লবীরা নিজ নিজ বাস্তবতার সীমার মধ্যেই ভূমিকা পালন করে, এবং যথারীতি ব্যর্থ হয়। তাদের সক্রিয়তার ধরন আর ব্যর্থতা সম্ভাব্য নতুন রাজনীতির বার্তা ঘোষণা করে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে খিজিরের অ্যাকশনের একটা ছবি আছে। বেবি ট্যাকসিটা আরেকজনকে দিয়ে হেঁটে-দৌড়ে সে শামিল হয় মিছিলে। গিয়ে পড়ে পুলিশের নির্বিচার অত্যাচারের মুখে। রাইফেলের বাঁটের একটা বাড়ি বাদ দিলে সে অক্ষতই থাকে। কিন্তু 'তার কানে তখন স্লোগানের পিপাসা। স্লোগান শুনলেই বুঝবে যে মানুষ পুলিসকে রুখে দিয়েছে' (আখতারুজ্জামান, ২০০৪ : ১০২)। খিজির যে মিছিল-মিটিঙে সীমিত অর্থে নেতৃত্বের মর্যাদাই প্রায় ভোগ করে, তার এক কারণ আলাউদ্দিন মিয়ার চাওয়া। মহল্লায় নিজের দাপট দেখানোর জন্য এবং কেন্দ্রের ক্ষমতাচক্রে নিজের সংহত অবস্থানের জন্য আলাউদ্দিন মিয়ার দরকার মিছিলে লোক জোগানোর সামর্থ্য। আর মহল্লা থেকে রিকশাওয়ালাদের গুছিয়ে মিছিলে শরিক করানোর কাজটা খিজিরের মতো গুছিয়ে আর কে করতে পারে? খিজির যে এ কাজ উপভোগ করে তার বিস্তর নমুনা পাওয়া গেছে। কিন্তু আলাউদ্দিন মিয়ার আশকারা আর রহমতউল্লার প্রতি ক্ষোভ খিজিরের কর্মকাণ্ডকে ব্যাখ্যা করার জন্য যথেষ্ট নয়। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে জীবন-জীবিকা, বউ, আশ্রয় ইত্যাদির সাথে জড়িয়ে-পেঁচিয়ে খিজিরের কর্মকাণ্ডকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে মাঝে মাঝেই মনে হয়, জীবনের বিচিত্র জ্বালাপোড়া নিবারণের একটা উপায় হিসাবে সে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এই সিদ্ধান্ত হয়ত সম্ভব। অন্তত ইলিয়াসের মতো একজন লেখকের ক্ষেত্রে, যিনি 'মহিমা' ক্ষুণ্ন করার কাজ বিস্তর করেছেন, মহিমান্বিত করার কাজ সে অনুপাতে করেননি বললেই চলে। কিন্তু খিজিরের ক্ষেত্রে এ সিদ্ধান্ত নিলে তা খুবই একচোখা হবে। এ উপন্যাসে আরো বহু লোক প্রতিকূলতার মধ্যে কালাতিপাত করেছে। তাদের সবাই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েনি। বউয়ের পাশে শুয়ে থেকে বউয়ের অশ্রাব্য 'প্যাঁচাল' শুনতে শুনতে খিজির যেভাবে সেদিনের আন্দোলনের হিসাব-নিকাশ সেরে নিচ্ছিল, কী তার করা উচিত ছিল কিন্তু করা হয় নাই বা আগামী দিনের কাজ কিভাবে সর্বোত্তম প্রস্তুতি নিয়ে করতে হবে তার পর্যালোচনা সেরে নিচ্ছিল বউয়ের কথার টুকটাক জুৎসই জবাব দিতে দিতে, তাতে মনে হয়, চলমান গণআন্দোলন তার অস্তিত্বের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে এবং তার প্রস্তুতিটাও জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে চলছে।

বারবার দেখা গেছে, খিজির তার রাজনৈতিক সক্রিয়তার ব্যাপারে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ সচেতন। তার মাধ্যমে ইলিয়াস এই গণআন্দোলন আর সংশ্লিষ্ট রাজনীতির কিছু দিক বলিয়ে নিয়েছেন। ২৪ নম্বর পরিচ্ছেদে এর এক চমৎকার নিদর্শন মেলে। খিজিরের অপরাধ কমিয়ে দেখানোর জন্য জুম্মনের মা লোকজনকে শুনিয়ে বলছিল, আলাউদ্দিন মিয়ার কাজ করে বলেই খিজিরকে মিছিল-মিটিং করতে হয়। তার কথার লক্ষ্য উপস্থিত লোকজনের কাছে খিজিরের কাজের একটা নিরাপদ ব্যাখ্যা দাঁড় করানো। খিজির বউয়ের বেশির ভাগ কথারই জবাব দেয় না। কিন্তু এ প্রসঙ্গ আসার সঙ্গে সঙ্গেই সে বউয়ের ভুল ভাঙিয়ে দেয়া জরুরি মনে করে :

> আরে তুই চুপ কর না! মিটিঙে যাই কি আলাউদ্দিন মিয়ার লাইগা? তামাম ঢাকার মানুষ মিটিং করে না? মানুষ চেতছে, তর মহাজনের বাপের বাপ, দাদার দাদা, — আইয়ুব খানের দিন বলে খতম হইয়া আইতাছে, তার হোগার মইদ্যে আড়াই ইঞ্চি মোটা পাইপ ঢোকে, তার ফাল-পাড়া দেখে ক্যাঠায়? ... (আখতারুজ্জামান, ২০০৪: ১৭৪)

ইলিয়াস কোনো চরিত্রের প্রতিই টানা পক্ষপাত দেখান না। মানুষকে যে কায়দায় তিনি শনাক্ত করেন, মানুষ সম্পর্কে হিসাব-নিকাশ সেরে ফেলে নির্যাস আকারে লেখায় উপস্থাপন করবার যেসব পাল্লা-বাটখারা ইলিয়াসের অনুমোদন পেয়েছে, তাতে আপাদমস্তক খারাপের নমুনা দুর্লভ নয়; কিন্তু ভালোর নমুনা পাওয়া যায় না। তবু পক্ষপাতের একটা ব্যাপার তো আছেই। যারা তাঁর আনুকূল্য খানিকটা পেয়েছে, তাদের একটা বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। এরা কেবল যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে শুদ্ধ তা নয়, কেবল যে কোনো বিশেষ কর্মকাণ্ডে ভালো তা নয়, বরং তাদের জীবনবোধ ও যাপনে একটা গভীর ভিন্নতা আছে, যাকে গভীরতর অর্থে রুচি বা প্রবণতা বলা যায় সম্ভবত, যা অন্য বিপুল মানুষ থেকে তাদের আলাদা করে।

খিজিরের বিপরীতে কামরুদ্দিনের কথাই ধরা যাক। জুম্মনের মা দুজনের সাথে ঘর করার অভিজ্ঞতা থেকে দুজনের তুলনা করে। মালিকের প্রতি কামরুদ্দিনের আনুগত্য বিশেষ ধরনের নৈতিকতাজাত, যাকে খুব স্বাস্থ্যকর বলা মুশকিল। একদিকে সে দেদারসে মালিকের রড-সিমেন্ট সরায়, অন্যদিকে আবার মালিকের অন্যায় আবদার মেনে নেয়। জুম্মনের মায়ের শাড়ি দেখে মালিকের বউ-ঝিয়েরা বিরূপ মন্তব্য করেছিল। তার সারমর্ম এই যে, ছোটলোকেরা এত ভালো শাড়ি পরলে তাদের মান-ইজ্জত থাকে কিভাবে? এ সংবাদ কামরুদ্দিনের কানে পৌঁছলে সে বউকে ওই শাড়ি পরতে বারণ করে। জুম্মনের মা তো অবাক। কামরুদ্দিন তাকে বুঝিয়ে বলে : 'মালিকের লগে পাল্লা দেওন ভালো না, বুঝলি? যার নেমক খাই তার উপরে টেক্কা মারতে গেলে খোদায় ভি গোস্বা হয়। গজব পড়ে, রোজগারপাতি পইড়া যায়' (আখতারুজ্জামান, ২০০৪ : ১৭৬)! রহমতউল্লার সাথে খিজিরের ব্যবহারের তুলনায় মনিবের সাথে কামরুদ্দিনের আচরণই জুম্মনের মায়ের কাছে অনেক স্বাভাবিক মনে হয়।

এই মূল্যায়নের মধ্যে ইলিয়াসের একটা সাধারণীকরণ প্রবণতা কাজ করেছে বলেই মনে হয়। চালু কাঠামোর মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে চলা ইলিয়াসের কাছে অপরাধতুল্য। মধ্যবিত্তের ব্যাপারে তাঁর চরম তাচ্ছিল্যের উৎসও এই মনোভঙ্গি। *চিলেকোঠার সেপাই* বা অন্য কোথাও কোথাও মানিয়ে-নিয়ে-চলাটা সামন্ত মূল্যবোধের পর্যায়ে পড়ে গেছে। 'পাকিস্তান' বা 'ধর্ম' এ ব্যাপারে একটা প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু ইলিয়াসের সামগ্রিক লেখালেখিতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যাপারটা বিপ্লবী রাজনীতির সাথে যুক্ত। প্রচলিত কাঠামোর যে অন্যায্যতাটা চোখে দেখা যায়, তা মেনে না নিয়ে নতুন কাঠামোর জন্য লড়াইয়ের সাথে যুক্ত। আনোয়ারের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি ঘটেছে রাজনৈতিক সচেতনতার মাধ্যমে, আর খিজির বা চেংটুর ক্ষেত্রে ঘটেছে চলমান জীবনযাপনের মধ্য দিয়েই — অচেতনভাবে। যেভাবেই ঘটুক, ইলিয়াসের কাছে তা মূল্যবান।

চেংটুর এই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে তার বাবার সাপেক্ষে। ১৫ নম্বর পরিচ্ছেদের শুরুতেই লেখক নাদু পরামাণিকের চেহারাটা পষ্ট করে আঁকেন। তার ভোঁতা চোখে আবেগ-অনুভূতিগুলোও ভোঁতা। কিন্তু চেংটুর 'চোখ বেশ স্বচ্ছ, রাগ কি ঘৃণা থেকে সেগুলো মুক্ত'। খয়বার গাজীর কাছে সে কিছুতেই যেতে চায় না। আনোয়ারের পরামর্শেও নয়। তার সাফ কথা: 'ঐ খুনীর সর্দারের কাছে যায় কোন শালা? হামি অর ভাত খাই, না উঁই হামাক জর্ম দিছে? অর কাছে হামার কিসের *ঠেকা*?' (আখতারুজ্জামান, ২০০৪ : ১১৪)

নাদু আসলে গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামোয় বিদ্যমান সামন্ত সম্পর্ককে স্বাভাবিক বলেই মেনে নিয়েছে। হাতের পাঁচ আঙুল সমান না — খয়বার গাজীর এই যুক্তি নাদুরও যুক্তি। ফলে যে যুক্তিতে গাজী সাহেব নাদু পরামাণিকদের অধীনতা ভোগ করেন আর জিইয়ে রাখতে চান, সে একই যুক্তিতে নাদুর মতো অনেকে অধীন থাকাকেই স্বাভাবিক বলে মনে করে। মেনে নেয়। লেখক নাদু প্রসঙ্গে এক ঘটনার উল্লেখ করেন, যা অনেকটা প্রতীকী তাৎপর্য পেয়ে যায়। নাদু ছোটবেলা থেকেই আনোয়ারদের মিয়াবাড়ির কামলা। তার বয়স যখন ১০/১১, তখন কাজে গাফিলতির অভিযোগে আনোয়ারের দাদা নাদুকে খড়ম পায়ে লাথি মেরেছিল। এ লাথি তার পিঠের চিরস্থায়ী ব্যথার কারণ হয়। মনিব যথারীতি তার চিকিৎসা করায়। কিন্তু ব্যথা আর সারে না। ইলিয়াস তার স্বভাবমতো নাদুর বদমায়েশিটাও পরিষ্কার করে জানিয়ে দেন : নাদু এই ব্যথাকে ব্যবহার করে মনিবের কাছ থেকে কিছু সুবিধা আদায় করেছে বৈকি! এই ব্যথা নিয়েই সে বাঁচে, যেমন বাঁচে চিরস্থায়ী অধীনতার সম্পর্ককে স্বাভাবিক জ্ঞান করে।

সমস্যা হয় চেংটুকে নিয়ে। সে এই ব্যথার মর্ম কিছুতেই বুঝতে চায় না। জরুরি প্রশ্ন হল : এই বুঝতে না চাওয়ার সাহসটা চেংটু কোথায় পায়? ইলিয়াস এর কোনো সদুত্তর দেন না। একটা উত্তর এরকম হতে পারে যে, গরুচুরিসহ গাজীদের নানাবিধ অত্যাচার সীমা ছাড়িয়েছে। কিন্তু এটা চেংটুর বিদ্রোহের একমাত্র কারণ নয়। তাহলে তার বয়সী আরো অনেককেই সে সঙ্গে পেত। বলা যায়, ভিতরের বিশেষ চেতনার কারণেই সে গাজীদের অত্যাচারের রূপটা অনেক পষ্ট করে দেখতে পায়, যা তার বাপসহ আরো অনেকের চোখ এড়িয়ে যায়। আরেকটা কারণ হতে পারে চলমান গণআন্দোলনের প্রভাব। কিন্তু এক্ষেত্রেও আগের কথাই প্রযোজ্য। বিশেষভাবে চেংটুই কেন গণআন্দোলনের প্রভাবে বাড়তি শক্তি আর প্রতিরোধ-প্রবণতা অনুভব করবে, তার কোনো ব্যাখ্যা ইলিয়াস দেননি বা দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। তিনি দুটি ছবি এঁকেছেন। ছবি দুটি উল্লেখযোগ্য।

এক. 'ছাইরঙ আরো গাঢ় হয়। মস্ত জোড়াদিঘির ওপারে মরিচের জমি, ছাইরঙের পাতলা অন্ধকারে পাকা মরিচের টকটকে লাল রঙ, হঠাৎ করে তাকালে, ছাইয়ের ভেতরকার আগুনের মতো ঝাপ্টা মারে।' (আখতারুজ্জামান, ২০০৪ : ১১৬)

দুই. 'কথা বলতে বলতে চেংটু কখন যেন উঠে পড়েছে দালানের ভাঙা স্তূপে। আনোয়ার এবার ভালো করে তার দিকে দেখলো। আনোয়ারের দাদাজী মারা যাওয়ার ৩ বছর আগে এই বৈঠকখানা দালানে চিড় ধরে, নতুন করে তৈরি করার জন্য গোটা দালান ভেঙে ফেলা হয়। সেই বছর তার মৃত্যু হলো। এরপর আর কিছু করা হয়নি। চেংটু সেই স্তূপের উঁচু চূড়ায় দিব্যি পা ঝুলিয়ে বসেছে। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে তার মুখ অস্পষ্ট।' (আখতারুজ্জামান, ২০০৪ : ১১৭)

প্রথম ছবিটি বিপ্লব-বিদ্রোহের আলামত হিসাবেই পাঠ্য। পরিস্থিতি যা, তাতে এই উপলব্ধ আগুনের ধারক হিসাবে চেংটুকেই পাঠ করতে হয়। দ্বিতীয় ছবিটি অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট। পুরনো দালানের ভাঙন আর তার অবশেষের ওপর চেংটুর চড়ে বসা ক্ষমতা-সম্পর্কের নতুন বিন্যাসকেই ইশারায় দেখায়। ইশারা মাত্র। নিশ্চয়তা নয়। তাই এই স্পষ্ট ছবিতে চেংটুর মুখটা অস্পষ্টই থাকে।

খিজির এবং চেংটু বিপ্লবী পরিবর্তনের অনুঘটক হিসাবে লেখকের মনোবাসনা প্রকাশ করে। এই বাসনা কাল্পনিক নয়। উনসত্তরের গণআন্দোলনে এ বাসনার প্রাসঙ্গিকতা তৈরি হয়েছিল। বিদ্যমান পার্টি-রাজনীতির সীমায় সেই বাসনার পরিপূরণ সম্ভব নয়। বিপ্লবী পার্টিও অনুপস্থিত।[৯] তাই আন্দোলনের ফল জনজীবনে কোনো প্রভাব না ফেলেই শূন্যে মিলিয়ে যায়। কিন্তু দৃষ্টিগ্রাহ্য সাফল্য না এলেও বাংলাদেশের পরবর্তী আন্দোলন-সংগ্রামে উনসত্তরের অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই বহু মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছিল। এমন সব মানুষ, জাতীয়তাবাদী বয়ানগুলো যাঁদের 'জনগণ' নাম দিয়ে হিসাবের বাইরে রেখে দেয়। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর এক উৎসর্গপত্রে মন্তব্য করেছেন : 'বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ যে ঘটে, তার পিছনে ঢাকা শহরে ও সুদূর গ্রামে গরিবরা কী ভূমিকা পালন করে, তাই নিয়েই তিনি লেখেন 'চিলেকোঠার সেপাই'' (মহাশ্বেতা, ১৯৯৮ : ১৮)। *চিলেকোঠার সেপাই*র এ পাঠ অপ্রচলিত, কিন্তু গভীরভাবে সারবান। জাগ্রত-চৈতন্যের গণমানুষই আন্দোলন-সংগ্রামের সাফল্যের কারণ। নেতৃত্বে আসীন পার্টিগুলো নিজেদের কর্মসূচিগত সীমাবদ্ধতা আর কাঠামোগত অপূর্ণতার কারণে এর স্বীকৃতি দিতে পারে না। *চিলেকোঠার সেপাই* সেই স্বীকৃতির এক বলিষ্ঠ ও কার্যকর আধার।

স্পষ্টতই চিলেকোঠার সেপাই উপন্যাসে গণআন্দোলন পার্টি-রাজনীতির চেয়ে অনেক ব্যাপক-গভীর ধারণা, যার সফল পরিণতির জন্য যথার্থ কর্মসূচিসহ জনগণের পার্টি আবশ্যক। ৩৩ নম্বর পরিচ্ছেদে পল্টনের সমাবেশের পর হোটেলে আন্দোলনকারীদের নানা পক্ষ তর্কে লিপ্ত হয়। আইয়ুব খানের সহায়ক পক্ষ হিসাবে আমলাদের কথা আসে, আর্মির কথা ওঠে। জাতীয়তাবাদী যুক্তি হল : সব বাঙালি তাদের সাথে আছে। আমলা, মিলিটারি — সব। কথা ওঠে, শেখ মুজিবকে ছেড়ে দিলে কী হবে? উত্তর : আন্দোলন আরো সুশৃঙ্খলভাবে চলবে। কিন্তু শেখ মুজিবের রাজনৈতিক চর্চার ধরন ও ইতিহাসের সাথে তো এই গণআন্দোলনের চরিত্রের পার্থক্য আছে। এমনকি তাঁর সংগঠনের চরিত্রের সাথেও। উত্তর : 'পিপল' যাদের নেয় তারাই থাকবে। সিদ্ধান্ত : 'আপনারা যদি টেকেন তো ওনলি এ্যাট দ্য কস্ট অব দ্য মুভমেন্ট' (আখতারুজ্জামান, ২০০৪ : ২২৫)। এই সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই বামপন্থিদের। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে গণআন্দোলনকে পার্টি-রাজনীতির বাইরে স্বতন্ত্র মহিমা দেয়া হয়েছে।

গণআন্দোলন এ উপন্যাসে এক বিশেষ ধারণা, যা ক্ষমতা-কাঠামোর উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সবকিছুকেই পুনর্বিন্যস্ত করে। সম্ভাবনা তৈরি করে নতুন ক্ষমতা-কাঠামোর। অন্তত দীর্ঘদিনের ক্ষমতা-ক্লেদ পরিবর্তিত হয়ে নতুন কিছু হয়। আন্দোলনের যে অংশটি দলীয় রাজনীতির সাথে যুক্ত, মানে এক বিকল্প ক্ষমতা-কাঠামোর অংশীদার, তারাই নানাভাবে এর বিপ্লবী চরিত্র নষ্ট করে। ইলিয়াস অনেকগুলো উদাহরণ দিয়েছেন। গ্রামের তো বটেই, শহরেরও। একটা উদাহরণ আছে ৩৪ নম্বর পরিচ্ছেদে। আলাউদ্দিন মিয়াদের পাশের মহল্লার সর্দার আন্দোলনের এক পর্যায়ে আওয়ামীলীগে যোগ দিতে চায়। আলতাফ পাত্তা দেয়নি। কিন্তু আলাউদ্দিন মিয়া তার যোগদানের মধ্যে আন্দোলন ও পার্টির নানা উপকার দেখতে পায়। মিটিঙের দিন সর্দারকে সভাস্থলে দেখে জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। আলাউদ্দিন বিস্তর যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করে। কাজ হয় না। শেষে ভার্সিটির ছাত্ররা লোকজনকে বোঝাতে সমর্থ হয়। লেখক আগেই বলেছেন, সর্দার ভার্সিটির হলেও যোগাযোগ করেছিল।

গণআন্দোলনে নিম্নশ্রেণির মানুষের এক ধরনের ক্ষমতায়নের কথা বারবার বলা হয়েছে। ৩৪ নম্বর পরিচ্ছেদে ভালো একটা উদাহরণ আছে খিজিরের নিজের জীবনের। তার সন্তান তখন বউয়ের গর্ভে। রহমতউল্লা সেই সন্তান নষ্ট করে ফেলতে চায়। খিজির ওসমানকে অনুরোধ করে সে যেন আলাউদ্দিন মিয়াকে বলে এই গর্ভপাতের ব্যাপারটা কিছুদিন পিছিয়ে দেয়। কিছুদিন পরেই আইয়ুব খানের পতন হবে। তখন সর্দারের ক্ষমতাচ্যুতি হবে। সর্দার আর তার বউকে গর্ভপাতের জন্য চাপ দিতে পারবে না। গণআন্দোলনের প্রভাব কত গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত, তার এক মোক্ষম উদাহরণ এই ঘটনা।

গরিব মানুষের ক্ষমতায়নটা হয় আন্দোলনে সক্রিয়তা আর সম্পৃক্তির মধ্য দিয়ে। *চিলেকোঠার সেপাই* জানিয়ে দেয়, এ ধরনের সক্রিয় সম্পৃক্তি তাদের পক্ষেই সম্ভব — মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্তের পক্ষে নয়; কিন্তু সুযোগটা তৈরি হয় আন্দোলনের বিশেষ মুহূর্তে। ইলিয়াস কথাটি নানান জায়গায় নানাভাবে বলার চেষ্টা করেছেন। লোকজন আগুন লাগিয়ে দিয়েছে এক হোটেলে। ওসমানের জিজ্ঞাসা : এটা তো গবর্নমেন্টের বাড়ি নয়। এখানে আগুন কেন? খিজিরের উত্তর :

> মিছিল যায় আর হোটেলের মালিক হালায় উপর থাইক্যা দুইটা পানিভরা ঠিলা ফালাইয়া দেয়! এতোগুলি মানুষরে বেইজ্জত করে, হালাগো হিম্মতটা দেখছেন? বুঝলেন না? সইবার পারে না! গরীব মানুষ সিনা ফুলাইয়া রাস্তার মইদ্যে নাড়া লাগাইয়া হাঁটে, হালাগো কইলজা এক্কেরে ফালা ফালা হইয়া যায়! (আখতারুজ্জামান, ২০০৪ : ১৬৬)

আন্দোলনের উত্তুঙ্গ মুহূর্তে ক্ষমতা-কাঠামোর শিথিলতার ফাঁকে 'হালাগো হিম্মত' অগ্রাহ্য করার মওকা পেয়ে যায় প্রান্তীয় জনগোষ্ঠী। মনস্তাত্ত্বিক-সাংস্কৃতিক 'অপরায়ণে'র বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলারও সুযোগ পায়। এ উপন্যাসের বিস্তৃত পরিসরে গণআন্দোলনের এই ইতিবাচক সংজ্ঞা তৈরি হতে থাকে।

৪.১

কিন্তু সম্ভাবনার অনিবার্য পরিণতি সাফল্য নয়। এ উপন্যাস সম্ভাবনার কথা বলে, সাফল্যের ছবি আঁকে না। গণআন্দোলন তার পরিণতির দিকে যায় পূর্বতন ক্ষমতা-কাঠামোর বদলের মধ্য দিয়ে। না, আন্দোলনকারী সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়ন হয় না। তবে আইয়ুব সরকারের সাথে যুক্ত সবকিছুই ভেঙে পড়তে থাকে। মন্ত্রী-সান্ত্রীরা আক্রান্ত হতে থাকে। মৌলিক গণতন্ত্রীরা হয় দল বদলায় নয় ক্ষমতাচ্যুত হয়। রহমতউল্লার স্ট্রোক হয় এক কার্ফিউর রাতে। ৩৭ পরিচ্ছেদে। তার পতন অন্যভাবে হয়। কিন্তু পরিস্থিতির চাপ নিশ্চয়ই তার স্ট্রোকে ভূমিকা রেখেছিল। তাছাড়া কার্ফিউর মধ্যে ডাক্তার-হাসপাতালের সমস্যার একটা প্রতীকী ব্যাখ্যা সম্ভব। তা না হলেও আলাউদ্দিন মিয়া যে তার পার্টিকেন্দ্রিক জানাশোনা আর ক্ষমতা ব্যবহার করে ডাক্তারের বন্দোবস্ত করে ফেলে, তার নিশ্চয়ই প্রতীকী মূল্য আছে। গণআন্দোলনের ফলে শ্রেণি-কাঠামোয় কোনো বদল হয় না। কিছু মানুষের বদল হয় মাত্র। এই ব্যর্থতার কারণ কী?

একটা গুরুতর কারণ তো বিদ্যমান পার্টি-রাজনীতির ব্যর্থতা। সুবিধাভোগী অংশ আন্দোলন-সংগ্রামের সুফল পকেটবন্দি করছে দেখে লেখকের আহাজারি কখনো কখনো ঔপন্যাসিকসুলভ নিরাসক্তিও যেন হারিয়ে ফেলে। কিন্তু মধ্যবিত্তের শ্রেণিচ্যুত হতে না পারার সংকটই শেষ পর্যন্ত এ উপন্যাসে গুরুতররূপে চিহ্নিত হতে থাকে।[১০] একটা ধরন প্রকাশিত হয় ওসমানের মধ্য দিয়ে। মৃত খিজির মাটিতে নামতে পারছে না, সাহায্য চাচ্ছে ওসমানের — এই পৌনঃপুনিক চিত্র মধ্যবিত্তের সাথে গণমানুষের দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের প্রতীকরূপেই পাঠ্য। উপন্যাসের শেষে ওসমানের রূপান্তরের মাধ্যমে এ সংকট মোচনের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। কিন্তু সে তো আকাঙ্ক্ষামাত্র। বাস্তব পরিস্থিতিতে যথার্থ জনমুক্তির রাজনীতির প্রশ্নে মধ্যবিত্তের সংকট চিহ্নিত হয়েছে আনোয়ারের মধ্য দিয়ে।

আনোয়ারের প্রতি অনেকদূর পর্যন্ত লেখকের পক্ষপাত টের পাওয়া যায়। অন্তত নাগরিক সমাজের আন্দোলন-সংগ্রামে তার উপর লেখক যথেষ্ট নির্ভর করেছেন। কারণ বোধ করি এই যে, আনোয়ার রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত। আনোয়ার মার খেয়ে যায় গ্রামে যাওয়ার পরে। এ পর্বে অবশ্য ক্ষমতা-কাঠামো ও আন্দোলনের সম্পূর্ণ নতুন রূপ দেখাতে চেয়েছেন লেখক। সেখানে শ্রেণি-অবস্থান আর নাগরিক মধ্যবিত্তের বুঝ — এ দুই প্রতিকূলতায় আনোয়ার কোণঠাসা হয়ে যায়। লেখক সেখানে খোদ আনোয়ারকেই শ্রেণি-রাজনীতির কিছু তাত্ত্বিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয় বানিয়ে ফেলেন। তা হলেও তার কাছ থেকেই পাঠক গ্রামপর্বের বিবরণ ও মূল্যায়ন পায়।

নগর-পর্বে আনোয়ার অনেকবার পরিস্থিতির মূল্যায়নের ক্ষেত্রে লেখকের প্রতিনিধিত্ব করেছে। ওসমান তার কাছে শুনতে চায়; কারণ, তার বিশ্লেষণ ভালো। তাতে পাঠকও শুনতে পায়। ঘটনাপ্রবাহের সমান্তরালে আলগোছে একটু ছাড়াছাড়াভাবে মূল্যায়নও জমা হতে থাকে — প্রত্যক্ষত আনোয়ারের বক্তব্যে, আর পরোক্ষত লেখকের বর্ণনাভঙ্গিতে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে হোটেল আমজাদিয়ায় এরকম দেখা গেছে। জাতীয়তাবাদীদের চাপে সেখানে আনোয়ার খুব একটা সুবিধা করতে না পারলেও তার কথাগুলো স্বতন্ত্রভাবেই জায়মান থাকে। তাতে তার রাজনীতির গভীরতা, জনসম্পৃক্ততা আর সূক্ষ্মতার পরিচয় পাওয়া যায়।

দশম পরিচ্ছেদে ওসমানের ঘরে আবার তার নিরাসক্ত বিশ্লেষণ শুনি। এনএসএফের খোকাকে পুলিশ ধরেছে ধর্ষণ-মামলায়। পত্রিকায় এটুকু পড়ে ওসমান নিশ্চিত ছিল। কিন্তু আনোয়ার শোনায় অন্য কথা : তাকে হাজতে পোরা হয়েছে আসলে তার নিরাপত্তার স্বার্থে। তার যুক্তিও তৈরি : 'মানুষ খুন করে সাফ করে ফেললো, এখন রেপের চার্জে ধরে!' এ থেকে আনোয়ার চলমান গণআন্দোলন সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত নেয় — আন্দোলন সরকারের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছে; 'গবর্নর হাউসও এখন গুণ্ডাপাণ্ডাদের জন্য যথেষ্ট সেফ নয়'। তাহলে এ আন্দোলনে সে ঝাঁপিয়ে পড়ছে না কেন? কারণ এখানে প্রোগ্রাম নাই, জনসম্পৃক্ততা নাই, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নাই। তুলনায় 'ছাত্রদের নতুন প্রোগ্রাম' এগারো দফা তার পছন্দ হয়েছে: 'স্টুডেন্ট ফ্রন্টে মনে হচ্ছে একসঙ্গে কাজ করা যাবে'। একটু পরেই আলতাফের সঙ্গে আনোয়ারের সংলাপে আনোয়ারের প্রতি লেখকের পক্ষপাত আরো ভালোভাবে

প্রকাশিত হয়েছে। আলতাফ যথারীতি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমকালীন ও পরবর্তীকালীন যুক্তিগুলো আওড়ে যায়। তাতে পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণের তত্ত্বটিই ঘুরে-ফিরে বড় হয়ে ওঠে। আর আনোয়ারের মুখে প্রধানত শ্রেণি-শোষণের কথা। জনমুক্তির প্রসঙ্গটি তার কথায় গভীর তাত্ত্বিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হতে থাকলে পাঠকের কাছে তার অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আলতাফের যুক্তিগুলো মোটেই দুর্বল নয়। তদুপরি চলমান গণআন্দোলন তার পক্ষেই, যে আন্দোলনের প্রতি পাঠকের ঐতিহাসিক পক্ষপাত লেখকের উস্কানিতে ততক্ষণে আরো চাঙা হয়ে উঠেছে। এমতাবস্থায় আন্দোলন সম্পর্কে আলতাফের বিশ্লেষণ পাঠকের জন্য আরাম ও স্বস্তির এনতেজাম করে। আবার, আন্দোলনের বৈধতা স্বীকার করেও আনোয়ার যখন জনকল্যাণের বরাতে তার রাজনৈতিক বিশ্লেষণ হাজির করে, সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক চিন্তার বাহক হিসাবে তার ভিন্নমত উপস্থাপন করে, তখন পুরো আন্দোলনের সমালোচনা হিসাবে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবেই তা পাঠকের ভাণ্ডারে জমা হতে থাকে।

আনোয়ারের মুখ দিয়ে ঐতিহাসিক ছয় দফা আন্দোলনের এবং সার্বিক গণআন্দোলনের তীব্র সমালোচনা করিয়েছেন লেখক ওই দশম পরিচ্ছেদেই। আলতাফের পার্টির ছেলেরা নিহত তালেবের ভাই রঞ্জুকে নিয়ে যাবে মিটিঙে। এ কথা শুনে আনোয়ারের প্রতিক্রিয়া :

> তা ওর ছোটো ভাইকে পাবলিকলি কান্নাকাটি করার জন্যে পটাতে পারলো? কেন, ওর বাপ টাপ নেই?' বলতে বলতে আনোয়ার উত্তেজিত হয়, 'বুড়ো অথর্ব টাইপের বাপ হলে আরো জমে। কাঁপতে কাঁপতে স্টেজে দাঁড়াবে, কাঁদতে কাঁদতে পড়ে যাবে। ব্যাস সার্থক জনসভা! তারপর নাটক শেষ হলে অর্গানাইজাররা বুড়োর পাছায় লাথি মেরে বলবে, 'ভাগ শালা, বাড়ি গিয়ে প্যানপ্যান কর! (আখতারুজ্জামান, ২০০৪ : ৭৭)

গণআন্দোলনের যে অংশের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের হাতে সে অংশের মূল্যায়ন করেছে আনোয়ার। শব্দ-ব্যবহারের ভঙ্গির মধ্যে যতটা সম্ভব নেতিবাচকতা আরোপ করেছে সে। এ দৃষ্টিভঙ্গি লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবেই বিবেচ্য। আলাউদ্দিন মিয়া, আলতাফ থেকে শুরু করে ওই সংগঠনের অন্য নেতা-কর্মীদের আচরণ, মিটিঙের বর্ণনা, গ্রামে গণআন্দোলনের ফলে ক্ষমতাবান হয়ে ওঠা নতুন নেতাদের ক্ষমতাচর্চার যেসব নমুনা উপন্যাসটিতে স্থান পেয়েছে, তার প্রায় কোনোটিই ভিন্নমত হাজির করে না। এ থেকে নির্দ্বিধায় বলা যায়, আনোয়ারের এই দৃষ্টিভঙ্গি আসলে লেখকেরই মূল্যায়ন।

গ্রামে আনোয়ার গরিব মানুষের উপকারই করতে চায়। চেংটুকে মামলা থেকে উদ্ধার করার জন্য সে আন্তরিকভাবেই গাজীর সাথে দেনদরবার করে। কিন্তু দুই সমস্যার কারণে সে বিশেষ সুবিধা করতে পারে না।

এক. সে গ্রামের সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে। যাদের হয়ে সে লড়তে চায়, তাদের শত্রুপক্ষীয়দের সঙ্গে তার আত্মীয়তা। ইলিয়াস খুব কৌশলে দেখান, অব্যাহত চেষ্টার পরও আনোয়ার কিছুতেই শ্রেণির ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না। এখানে লেখক শ্রেণিচ্যুতি-সংক্রান্ত জটিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান।

দুই. আনোয়ার গ্রামীণ কাঠামোর সমস্যাগুলো কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। তার শিক্ষার ভাষার সঙ্গে গ্রামের অশিক্ষিত মানুষজনের ভাষার এন্তার তফাত।

জালাল মাস্টারের বাড়ি থেকে অনেক রাতে চেংটুর সাথে ফেরার পথে আলাপচারিতায় (ষোড়শ পরিচ্ছেদ) তার সমস্যাটা পরিষ্কার ধরা পড়ে। এখানে ইলিয়াস তাকে প্রায় হাস্যকর করে তোলেন। চেংটুর অশিক্ষিত গোয়ার্তুমি, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন, আর বোধবুদ্ধিহীনতা তাকে বিরক্ত করে ফেললে পাঠক আসলে তার অসহায়ত্বই টের পেতে থাকে। চেংটুর সরল কিন্তু বলিষ্ঠ উচ্চারণে গ্রামীণ ক্ষমতা-কাঠামো আর শোষণ-নিপীড়নের পরিচ্ছন্ন মূর্তি তৈরি হতে থাকলে আনোয়ার বরং তার ভদ্রলোকী শিক্ষা আর বাস্তবতাবর্জিত তত্ত্ব নিয়ে কোণঠাসা হয়ে যায়। তাকে আরো ন্যাংটো করে দিয়ে লেখক বটগাছের অশরীরী প্রাণিটিকে বিস্তারিত পরিসর দেন। চেংটু এই প্রাণের অস্তিত্ব আর ক্ষমতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়েও অবিচলিত পদক্ষেপে পথ চলে। আর আনোয়ার জ্বিন-ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাসকে রীতিমতো অপরাধ হিসাবে উপস্থাপন করে চেংটুকে জ্ঞান দিতে দিতে ভয়ে চিমসে যেতে থাকলে তার এবং শহুরে মধ্যবিত্তের ধরন সম্পর্কে পাঠকের শিক্ষা হয়। বলা যায়, চেংটুর কাছে ইলিয়াস আনোয়ারকে সাধ্যমতো পরাস্ত করে ছাড়েন।

অবশ্য সংকটটি আনোয়ার নিজেই টের পায় বলে শেষ পর্যন্ত সে খলনায়ক বা হাস্যাস্পদ হয়ে ওঠে না। করমালির সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে তার নিজের মূল্যায়ন : 'করমালি কথা বলে একটু বেশি। এটা বরং ভালো। আনোয়ারের এতে সুবিধাই হয়। চেংটুর মতো হঠাৎ করে গম্ভীর হয়ে আনোয়ারের অকারণ অপরাধ বোধটিকে কাঁটার মতো উস্কে তোলে না। চেংটু চুপ করলেই মনে হয় খুব মনোযোগ দিয়ে সে যেন তাকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে' (আখতারুজ্জামান, ২০০৪ : ১৩০)। এ ধরনের আত্মসমালোচনা সবসময় জারি থাকায় আনোয়ারকে শেষ পর্যন্ত নেতিবাচক চরিত্রের কোটায় ফেলা মুশকিল।

নেতিবাচক নয়, আবার কাজেরও নয়। ঢাকায় ফেরার জন্য ওসমানের অসুস্থতাকে সে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে। ঢাকায় সে কাজের কোনো সম্ভাবনা দেখে না, আবার করমালির সাথে গ্রামে যাবে বললেও কিছুতেই দ্বিধা কাটাতে পারে না। গণআন্দোলন আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে এসে যে সাবেক অবস্থাকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করছে, এ ব্যাপারে তার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। আলতাফকে সেকথা সে জোরের সাথেই মনে করিয়ে দেয় : 'কোন কাগজে পড়লাম, বত্রিশ নম্বর নাকি মার্শাল ল-র খবর পেয়ে বাক্স পেটরা সাজিয়ে ঘরের বারান্দায় বসেছিলেন। আর্মি এলেই ওদের গাড়িতে উঠে পড়বেন' (আখতারুজ্জামান, ২০০৪ : ৩১৮)। শেখ মুজিব আর আওয়ামী রাজনীতির তাত্ত্বিক-ব্যবহারিক সীমাবদ্ধতা — বিশেষত মানুষের প্রকৃত মুক্তির প্রেক্ষাপটে — সে ভালোই ব্যাখ্যা করে। তার ব্যাখ্যায় লেখকের অনুমোদনও স্পষ্ট। কিন্তু নিজের কর্মপদ্ধতি সে ঠিক করতে পারে না। আত্মীয়স্বজনের পুরুষানুক্রমিক শয়তানির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা, তাদের কাছে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিতে পরিণত হওয়া, আবার যাদের সঙ্গে কাজ করবে তাদের নিরঙ্কুশ আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হওয়া — এই ত্রিশঙ্কু অবস্থার মধ্যে আনোয়ার নয়া-রাজনীতির জটিলতারই প্রতীক হয়ে ওঠে। সাফল্যের নয়।

নাগরিক মধ্যবিত্তের কয়েকটি অংশের — পার্টি-রাজনীতির তল্পিবাহক আলতাফ, সহানুভূতিসম্পন্ন কিন্তু অক্রিয় ওসমান, আর রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত ও সক্রিয় আনোয়ারের — ব্যর্থতাকেই লেখক গণআন্দোলনের শোচনীয় পরিণামের মূল কারণ হিসাবে উপস্থাপন করেন।

৪.২

গণআন্দোলনের সর্বাত্মক ব্যর্থতার পরিচয় আছে উপন্যাসের শেষাংশে। লেখক জাতীয়তাবাদী গালগল্প নিয়ে বিস্তর ঠাট্টা করেছেন। পাঞ্জাবিদের বিরুদ্ধে বাঙালির এই লড়াইয়ে শোষণের ফিরিস্তি আর বাঙালিদের ওপর অত্যাচারের বয়ান পরিপূর্ণ সাফল্যের সাথে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু শ্রেণিবিভক্ত অন্যায্য বাঙালিসমাজে ন্যায়-প্রতিষ্ঠার কথাটা জাতীয়তাবাদীরা তোলেনি — আন্দোলনের সময়ে তো নয়ই, আগে-পরেও নয়। লেখক বামপন্থিদের মুখে এই অবস্থানের সমালোচনা পুরো উপন্যাস জুড়েই জারি রেখেছেন। শেখ সাহেব মুক্তি পাওয়ার পর তিনি ঠাট্টার পরিমাণ যেন আরেকটু বাড়িয়ে দেন। শেখ সাহেব রিলিজড হয়ে রেসকোর্সে ভাষণ দেন। পরে পুলিশের হামলা ঠেকাতে গিয়ে জনতার একাংশ ঢুকে পড়ে ঢাকা ক্লাবে। উত্তেজিত জনতা ক্লাব আক্রমণ করে। ক্লাবের একজন বেরিয়ে প্রশ্ন করে : 'আমরা কি বাঙালি নই' (আখতারুজ্জামান, ২০০৪ : ২৮৩)? মহল্লায় ফিরে ওসমান দেখে আলাউদ্দিন মিয়া বিদ্যুৎ-বিভাগের কর্মীদের ওপর রাগ ঝাড়ছে – দশ ঘন্টা কারেন্ট নাই। কারা কষ্ট পাচ্ছে? বাঙালিরাই তো!

দেখা যাচ্ছে, পাঞ্জাবিদের বিপরীতে বাঙালিত্বের যে পরিচয় আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নির্মিত হয়েছে, তার যথেচ্ছ অপব্যবহার হয়েছে ওই বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের হাতেই। এমনকি আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি বদলানোর কাজেও ব্যবহৃত হয়েছে একই আবেগ :

> রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্র থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের ১টি বাণী বারবার প্রচার করা হচ্ছে। রেসকোর্সের লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশে আজ এই শপথ নেওয়া হয়েছে যে শহীদদের রক্তে রঞ্জিত আন্দোলন যেন উত্তেজনা সৃষ্টির দ্বারা লক্ষভ্রষ্ট না হয়। সব রকম প্ররোচনা ও উত্তেজনার মুখে তাঁর প্রাণপ্রিয় দেশবাসী যেন আইন, শৃঙ্খলা ও শান্তি রক্ষা করেন। (আখতারুজ্জামান, ২০০৪ : ২৮৪)

আইন-শৃঙ্খলা-শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরের পরিস্থিতি বর্ণনা করেছে করমালি। পুলিশি নির্যাতন ঠেকাতে ঢাকায় পালিয়ে আসা গণ-আদালতের এই কর্মী আনোয়ারকে গ্রামের পরিবর্তিত অবস্থা জানায় :

> আফসার গাজী থানা পর্যায়ে বড়ো নেতা হতে চলেছে। মিটিঙে মিটিঙে তার চাচা খয়বার গাজীর নামে যা-তা বলে বেড়ায়। ওর চাচা হলো আইয়ুব খানের দালাল, বাঙালির শত্রু। দালাল চাচার আধপোড়া বাড়ি ঘর দখল করার জন্য আফসার হন্যে হয়ে উঠেছে। এদিকে এইসব কথা বলে, আবার বৈরাগীর ভিটায় গণ-আদালত বসিয়ে যারা এদের বিচার দাবী করেছিলো নানাভাবে তাদের সর্বনাশ করার চেষ্টা করছে। তার সঙ্গে সদাসর্বদা এক দঙ্গল কলেজের ছাত্র, ... (আখতারুজ্জামান, ২০০৪ : ৩০৪)

'সরকার পাট্টিও তারা, আবার অন্য পাট্টিও তারাই।' — করমালির এই মূল্যায়নে ফুটে উঠেছে গণআন্দোলনের মূল ব্যর্থতা। শুধু গ্রামে নয়, শহরেও। আলাউদ্দিন মিয়া উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদগুলোতে একেবারেই রহমতউল্লার বিকল্প প্রতিমূর্তি আকারে হাজির হয়। এমনকি তার উচ্চারণও হুবহু রহমতউল্লার মতো হয়ে ওঠে।

বৈরাগীর ভিটার বটগাছ-কাহিনিকে বলা যায় গণআন্দোলন-সম্পর্কিত মূল্যায়নের প্রতীকী প্রকাশ। চেংটু আর জালাল মাস্টারের বয়ানে বটগাছের বেশ জমকালো ফিরিস্তি তৈরি হয়। তাতে এই বটপল্লিতে অশরীরী জীবের যেমন সংস্থান হয়, তেমনি গ্রামবাসীর ভালোমন্দের সাথেও গাছটি জড়িয়ে পড়ে। জালাল মাস্টারের বয়ানে এই বটগাছের সাথে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের একটা জুতসই সম্পর্কও তৈরি হয়। ৩৯ নম্বর পরিচ্ছেদে আছে বটপ্রাঙ্গণের জঞ্জাল-সাফের প্রসঙ্গ। কাটছে তারাই যারা এর অলৌকিকতার বড় ভোক্তা। দরকারে কাটছে। গণ-আদালত বসবে। প্রচুর লোক। জায়গা দরকার। কাটে প্রধানত দূরের লোকজন, যারা এ গাছ সম্পর্কে তেমন জানে না। আর চেংটু। চেংটুর মধ্যে বিপ্লবীর বৈশিষ্ট্য এখানেও অক্ষুণ্ন থাকে। বটগাছ কাটার বর্ণনা লেখক যেভাবে দিয়েছেন, তাতে বোঝা যায়, দীর্ঘদিনের জঞ্জাল দূর হওয়ার একটা প্রতীক হিসাবে একে তিনি ব্যবহার করতে চেয়েছেন।[১১] এই বটগাছতলায় পরে মিটিং করে জাতীয়তাবাদীরা। আনোয়ারের বড় মামা। বিরোধী দলের রাজনীতি করা জেল-খাটা বড়মামা। সাথে আফসার গাজী। ঢাকা থেকে লোক আসে। কলেজের ছাত্ররা আসে। খয়বার গাজীসহ সবার সাথে মিলেমিশে থেকে পশ্চিমা শত্রুদের সাথে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে বক্তৃতা করে। আন্দোলনকারীদের সাফ করা ময়দান দখল করে তারা গ্রামে স্থিতাবস্থা তৈরি করে। স্থিতাবস্থার মধ্যেই খুন হয়ে যায় চেংটু। চেংটুকে হত্যা করার পর ভদ্রলোকেরা প্রচার করে যে বটগাছ কাটার কারণে তাকে জ্বিন মেরে ফেলেছে। এ ব্যাপারে জালাল মাস্টারেরও কোনো সন্দেহ থাকে না।

চিলেকোঠার সেপাই উপন্যাসের বটগাছ-কাহিনি এক বিশদ প্রতীকে 'বেহাত বিপ্লবে'র কথাই বলে।

৫

ওসমানের পাগলামির মধ্যে অসফল গণআন্দোলন নির্মিত হয়েছে আগুন ও পানির বৈপরীত্যে। রেসকোর্সের ময়দানে লক্ষ লোকের সমাগমে ওসমান আগুন দেখে না, পানির রাজত্ব দেখে। তার পাগলামির যে লম্বা বর্ণনা লেখক দিয়েছেন, তাতে নিশ্চয় করে বলা যায়, প্রতীকী পাঠ ছাড়া এর অন্য কোনো পাঠ সম্ভব নয়। তার পাগলামি এক ঘরে এনে ফেলেছে করমালি, আনোয়ার, আলতাফ, জুম্মন সবাইকে। তাদের আখেরি কর্মকাণ্ড আর মতিগতিতে লেখক পুরো কাহিনি আর পূর্বাপর ঘটনার সার্বিক গ্রন্থিমোচনটা আরামেই করেন।

রঞ্জুর প্রতি ওসমানের ক্ষোভটা বিশেষভাবে বিবেচ্য। কিছু আগের হস্তমৈথুন দৃশ্যে রানু, রঞ্জু আর ওসমানের ছেলেবেলা পালাক্রমে হাজির হওয়া থেকে আত্মরতির ধারণাটা

পোক্ত হয়েছিল। ৪৮ নম্বর পরিচ্ছেদে রঞ্জুকে চুমু দেওয়ার মধ্য দিয়ে সেই আত্মরতির প্রসঙ্গটাই আবার ব্যবহৃত হয়েছে। নামসাদৃশ্যকে লেখক এভাবে কার্যকরভাবে ব্যবহার করেন। সেই রঞ্জুকে হত্যা করতে চায় ওসমান। এ আসলে নিজেকেই হত্যা করা। নিজের চার দেয়ালে বন্দি, স্বভাব-আলস্যে ভরা, দ্বিধাগ্রস্ত সেল্‌ফকে হত্যা করা। এভাবেই কেবল ওসমান মুক্ত হতে পারে খিজিরের সাথে বেরিয়ে পড়ার জন্য।

খিজির ওসমানসহ আরো অনেকের কাছাকাছি এসেছিল। আসতে পেরেছে মধ্যবিত্তের আন্দোলনে জোরদার ভূমিকা পালন করে। কিন্তু তার লক্ষ্য পূরণ হয়নি। হওয়ার কথাও নয়। মধ্যবিত্তের সাথে তার কোনো কার্যকর আপসরফাও হয়নি। ফলে সে মাটিতে পা রাখতে পারে না। শূন্যে ঝুলতে থাকে। একমাত্র ওসমানদের অকর্মা সেল্‌ফ ধ্বংস হলেই তারও মুক্তি সম্ভব। ওসমানকে আর ওসমান বলে চেনা যায় না — শেষ দৃশ্যে এ কথা বলে লেখক সেই সম্ভাবনার কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। এই আন্দোলনে তা হয় নাই। অন্য কখনো হতে পারে। বা মুক্তির জন্য হতেই হবে।

জুম্মন লেখকের আরেক পরীক্ষাক্ষেত্র। সে খিজিরের কাজ পছন্দ করেছে। ওসমানের কথা সে ভালোই বুঝতে পারে। জুম্মনের মধ্য দিয়ে এভাবে খিজিরের স্পিরিট সঞ্চারিত হয়ে যায় পরের প্রজন্মে।

কিন্তু যথার্থ কর্মসূচি নিয়ে সুশৃঙ্খল বিপ্লবী পার্টি গঠিত না হলে এসব ব্যক্তিগত মুক্তি অর্থবহ পরিবর্তন আনতে পারবে না। নাগরিক প্রেক্ষাপটে এ ধরনের কোনো সম্ভাবনা এ উপন্যাসে দেখা যায় না। এমনকি গণআন্দোলনে বামপন্থিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উল্লেখ থাকলেও লেখক বিশেষভাবে কোনো পার্টি বা গ্রপকে চিহ্নিত করেননি। সেদিক থেকে আলিবক্সের দলই একমাত্র ব্যতিক্রম। আলিবক্স সম্ভবত লেখকের অনুমোদিত বিপ্লবী চরিত্র। আনোয়ারের মতো সাচ্চা বিপ্লবীর সাথে নানান ধরনের দ্বৈরথ তৈরি করে তিনি তাঁর পক্ষপাতটা আরো ভালোভাবে ফোটাতে চেয়েছেন। এই চরিত্র লেখকের বৈপ্লবিক ধ্যান-ধারণা আর বাংলাদেশের বাস্তবতায় বিপ্লবের ধরন সম্পর্কে একটা পরিচ্ছন্ন ধারণা দেয়। কলেজে পড়লেও গণমানুষের আকাঙ্ক্ষা আর ভাষায় তার পরিপূর্ণ দখল আছে। তার পার্টি সুশৃঙ্খল। প্রতিটি কর্মসূচিই তারা বাস্তবায়ন করেছে পরিকল্পনামাফিক। তার কর্মীরা একদিকে নিবেদিতপ্রাণ, অন্যদিকে নিজেদের কাজ সম্পর্কে প্রশিক্ষিত।[১২] ভদ্রলোক, মিলিটারি, পুলিশ — এই ত্রিপক্ষীয় আক্রমণে দলটি বিপর্যস্ত হয়েছে বটে; কিন্তু ভবিষ্যতের পথনির্দেশও করেছে।

চিলেকোঠার সেপাই উপন্যাসের কাহিনিতে গ্রাম আর শহরের যথার্থ মেলবন্ধন ঘটেনি। নন্দনতাত্ত্বিক বিচারে একে উপন্যাসটির সীমাবদ্ধতাই বলতে হবে। কিন্তু বাস্তবতার বিচারে না-ঘটাটাই অধিক তাৎপর্যবহ। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের দুস্তর ফারাক চিহ্নিত হয়েছে। একমাত্র বিপ্লবী পার্টি গ্রামকেন্দ্রিক হওয়ায় এ সত্যও ঘোষিত হয়েছে যে, বাংলাদেশের কাঠামোগত পরিবর্তনের রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রাম থেকে শুরু হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

টীকা

১. এ কথা কমবেশি পুরো উপন্যাসের ক্ষেত্রেই সত্য। বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন : 'চিলেকোঠার সেপাই' উনসত্তরের আন্দোলন নিয়ে লেখা একটি উপন্যাস হলেও সে আন্দোলনের একটা প্রামাণ্য (authentic) ঐতিহাসিক চিত্র এর আখ্যানভাগের মধ্যে পাওয়া যায়' (বদরুদ্দীন, ১৯৯৮ : ২০)। তাঁর এ মন্তব্য যথার্থ বলেই মনে হয়।

২. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সম্ভবত উপন্যাস লেখার সময় এসব ঐতিহাসিক বর্ণনা দেখেছেন। তা-ই স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁর বর্ণনার বিশেষত্ব নিজের অভিজ্ঞতা এবং বিচার-বিশ্লেষণ। তাঁর জীবনপঞ্জি-সংকলক লিখেছেন :

'আটষট্টি-উনসত্তুরে গণআন্দোলন প্রত্যক্ষ করেছেন ঘনিষ্ঠভাবে। প্রতিটি মিটিংয়ের মনোযোগী শ্রোতা! বিশেষত মওলানা ভাসানীর মিটিং কোনটাই বাদ যায় না। দৈবে সৈবে মিছিলেও যোগ দিচ্ছেন। আড্ডায়ও প্রতিদিনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ হচ্ছে।' (আখতারুজ্জামান, ২০০৪ : ৬৯৭)

গণআন্দোলন-সম্পর্কিত তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি আর মূল্যায়ন নিঃসন্দেহে এভাবেই তৈরি হচ্ছিল।

৩. 'ইলিয়াস তাঁর 'চিলেকোঠার সেপাই'-এ ঢাকা শহরের অবস্থার সাথে গ্রামাঞ্চলের অবস্থার যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে শহর ও গ্রামাঞ্চল মিলে সমগ্র পূর্ব বাংলায় আন্দোলনের মূল রূপটি যত স্পষ্টভাবে দেখা যায় উনসত্তরের ওপর লেখা অন্য কোন গল্প কাহিনী অথবা তথাকথিত ইতিহাসের মধ্যে সেটা দেখা যায় না।' (বদরুদ্দীন, ১৯৯৮ : ২১)

৪. গ্রাম-বাংলার প্রতিরোধ-সংগ্রাম সম্পর্কে বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন :

'আনোয়ারদের এলাকায় গরু চুরির যে ব্যাপারটির বিস্তারিত বর্ণনা আছে এবং যে ব্যাপার কেন্দ্র করে গ্রামাঞ্চলের গরীব কৃষকদের আন্দোলনের বৃত্তান্ত আছে সেটা ১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯-৭০ পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব বাঙলার অনেক এলাকাতেই ঘটেছিলো। চাঁদপুর, মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল, যশোর ইত্যাদি এলাকায় এই রকম গরু চুরির ঘটনা, ইউনিয়ন কাউন্সিলের মেম্বার চেয়ারম্যানদের এ দুষ্কৃতির সাথে সম্পর্ক এবং জনগণের হাতে তাদের কারও নিহত হওয়ার খবর তৎকালীন সংবাদপত্রে মাঝে মাঝেই প্রকাশিত হতো। এমনকি ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের অধিবেশনে এর ওপর প্রশ্নও সে সময় করা হয়েছিলো। ১৯৭০ সালে সাপ্তাহিক 'গণশক্তি'তে আমি যশোরের পাটকেলঘাটায় এ ধরনের একটা ঘটনার বিস্তারিত রিপোর্ট ছেপেছিলাম।

'আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের উপন্যাসটিতে যেভাবে এই গরু চুরির ঘটনার বিবরণ দেওয়া আছে এবং তাকে কেন্দ্র করে ১৯৬৯-এ গ্রামাঞ্চলের জনগণের আন্দোলনের বর্ণনা আছে সেটা তৎকালীন গ্রামাঞ্চলের অনেক এলাকার পরিস্থিতিরই একটা প্রামাণ্য চিত্র।' (বদরুদ্দীন, ১৯৯৮ : ২৩)

৫. আইয়ুব খানের পদত্যাগের দাবিতে পশ্চিম পাকিস্তানেও দুর্বার আন্দোলন হয়েছিল। বস্তুত সেখানে এ আন্দোলন শুরু হয়েছিল পূর্ব বাংলার অন্তত এক মাস আগে (Rounaq 2001: 172)। 'দীর্ঘ পাঁচ মাস (নভেম্বর থেকে মার্চ) ব্যাপী সারা পাকিস্তানে নিরবচ্ছিন্নভাবে' আন্দোলন চলার কথা আছে মোহাম্মদ ফরহাদের *উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান* প্রতিবেদনেও (মোহাম্মদ হাননান, ২০০৬ : ৩৮৮)। *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসে এই বাস্তবতা অনুল্লেখিত থেকে গেছে। শিল্পশ্রমিকদের কার্যকর অংশগ্রহণের ছবিও এ উপন্যাসে নাই। অথচ ১৯৬৯-এর শহীদদের পেশাভিত্তিক একটি তালিকায় দেখা গেছে, মোট ৬১ জনের মধ্যে ২৯ জনই শ্রমিক (হাননান, ২০০৬ : ৩৮০)। এ প্রসঙ্গে আনু মুহাম্মদ লিখেছেন : 'উপন্যাসে শিল্পশ্রমিকদের বিশাল ভূমিকার অনুপস্থিতিও যেন বিশাল সত্যকে স্বীকার না করবার সামিল হয়ে দাঁড়ায়' (আনু, ১৩৯৯ : ২৭)। উপন্যাসপাঠের দিক থেকে বলা যায়, বাস্তব তথ্যের গ্রহণ ও বর্জন দুইই শিল্পসত্যের কাঁচামাল হিসাবেই পাঠ্য।

৬. দ্রষ্টব্য : 'বাংলা মদ', 'বাংলামি', 'বেহাত বিপ্লব ১৯৭১' প্রভৃতি প্রবন্ধ।

৭. উপন্যাসে ঢাকা শহর ও গ্রামকেন্দ্রিক পরিচ্ছেদগুলোর বিন্যাস থেকে মনে হয়, এ দুইয়ের এক ধরনের সমান্তরালতা তৈরি করা লেখকের উদ্দেশ্য ছিল। ঠিক যান্ত্রিক সাম্য নয়, তাৎপর্যগত সাম্য। শুধু সামঞ্জস্য নয়, বিরোধও। শহর ও গ্রামের নিরিখে পরিচ্ছেদগুলোর বিন্যাস এ রকম : শুরু থেকে ১৩ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত শহরের বিবরণের পরে ১৪-২০ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত গ্রামের ঘটনাবলির বিন্যাস। এরপর ২৮-৩২। ৩৩-৩৮ শহর। ৩৯-৪০ গ্রাম। ৪১-৪২ শহর। ৪৩-৪৪ গ্রাম। শেষ কয়েকটি পরিচ্ছেদে শহর। আনোয়ারের গ্রামে যাওয়া বা করমালির শহরে আসা দুইয়ের কোনো কার্যকর মেলবন্ধন তৈরি করেনি। যদিও গ্রামীণ সমাজের প্রতিক্রিয়ায় কেন্দ্রের প্রভাব টের পাওয়া যায়।

৮. উল্লেখ্য আফসার গাজী প্রসঙ্গে চেংটুর অভিযোগ যে যথার্থ, তার প্রমাণ পাওয়া যায় পরের পরিচ্ছেদেই (পরিচ্ছেদ ১৭) — যাত্রাপালার প্যান্ডেলে, আনোয়ারের সাথে তার কথোপকথনে।

৯. নগরের ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। খিজির প্রসঙ্গে আনু মুহাম্মদ লিখেছেন : 'শিল্পশ্রমিক নয় বলে এ চরিত্র অতটা সংগঠিত নয়, অতটা সচেতন নয়' (আনু, ১৩৯৯ : ২৩)। *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসে শিল্পশ্রমিকের উল্লেখ লেখক একেবারেই করেননি, যেমন নাগরিক পরিমণ্ডলে এমন কোনো পার্টির পরিচয় দেননি যাকে বিপ্লবী পার্টি হিসাবে গণ্য করা যায়। তবে চেংটুর দল অর্থাৎ আলিবক্সের দল সম্পর্কে একথা বলা যায় না। এ থেকে মনে হয়, লেখক সমকালীন বাস্তবতায় প্রকৃত শিল্পশ্রমিক বা বিপ্লবী দল ছিল না বলেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আলিবক্সের দল সম্পর্কে বলা যায়, মধ্যবিত্তের সাথে প্রয়োজনীয় আঁতাত গড়তে না পারার কারণে তাদের উদ্যোগ সাফল্যের মুখ দেখেনি।

১০. মধ্যবিত্তের জনবিচ্ছিন্নতা ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিজাত সংকট। একদিকে উৎপাদনপদ্ধতির সাথে সম্পর্কহীনতা, অন্যদিকে জীবনবোধের ক্ষেত্রে উপনিবেশকের দাসত্ব — এই দুই বাস্তবতা উপনিবেশিত বাঙালি মধ্যবিত্তকে শক্ত ভিতে দাঁড়াতে দেয়নি। উপনিবেশ আমলে প্রান্তীয় জনগোষ্ঠী ব্রিটিশ-বিরোধী কোনো আন্দোলনেই মধ্যবিত্তের সহায়তা পায়নি। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, দেশবিভাগ-পরবর্তী ভারত, পাকিস্তান বা বাংলাদেশে এ অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস কেবল *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসে নয়, প্রায় সমস্ত রচনায় মধ্যবিত্তের জনবিচ্ছিন্নতা, স্বার্থপরতা, দ্বিধাগ্রস্ত চেতনা আর অক্রিয়তাকে নির্মম ভাষায় পরিহাস করেছেন।

১১. বটগাছতলার জঞ্জাল সাফ করার সাথে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *হাঁসুলি বাঁকের উপকথা* উপন্যাসের সমধর্মী ঘটনার মিল আছে। পার্থক্য এই যে, *হাঁসুলি বাঁকের উপকথায়* করালী ব্যক্তি-উদ্যোগে কাজটি করেছে। তার চেতনা বহিরাগত। *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসে কাজটি হয়েছে প্রয়োজনের তাগিদে। এজন্য এমনকি কুসংস্কার দূর করারও দরকার হয়নি।

১২. খিজির নয়, চেংটুকেই লেখক যথার্থ পার্টি-কর্মী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। আনোয়ারের স্বপ্নে ব্যাপারটা এভাবে প্রকাশ পেয়েছে : 'আনোয়ার খুব খুশি, চেংটুকে নিয়ে সে নানান জায়গায় যাবে। সবাইকে বলবে, এরকম কর্মী কেউ চোখে দেখেছে? ঢাকায় বসে তোমরা বিপ্লবের অবজেকটিভ কন্ডিশন দেখতে পাও, কিন্তু বিপ্লবের হাতিয়ার দেখতে চাও তো চেংটুকে দ্যাখো!' (আখতারুজ্জামান, ২০০৪ : ২৯০)

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ২০০৪, *রচনাসমগ্র ২*, চতুর্থ মুদ্রণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

আনু মুহাম্মদ ১৩৯৯, 'উনসত্তরের অভ্যুত্থান এবং আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের চিলেকোঠার সেপাই', *লিরিক*, সংখ্যা : আট, এজাজ ইউসুফী সম্পাদিত, চট্টগ্রাম।

ওয়াসি আহমেদ ১৯৯৭, 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : সংশয়ে বিশ্বাসে স্বপ্নে', *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস স্মারকগ্রন্থ*, সমীরণ মজুমদার সম্পাদিত, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর।

জিবলু রহমান ২০০৪, *১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ও মওলানা ভাসানী*, শুভ প্রকাশন, ঢাকা।

বদরুদ্দীন উমর ১৯৯৮, 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই'-এ গ্রামীণ জীবন ও রাজনীতি', *তৃণমূল*, ৪র্থ সংখ্যা, আনু মুহাম্মদ সম্পাদিত, ঢাকা।

মহাশ্বেতা দেবী ১৯৯৮, 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে মহাশ্বেতা দেবীর উৎসর্গ', *তৃণমূল*, ৪র্থ সংখ্যা, আনু মুহাম্মদ সম্পাদিত, ঢাকা।

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ১৯৯৮, *বাংলাদেশের তারিখ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

মেজবাহ কামাল ও আরিফাতুল কিবরিয়া ২০১১, 'উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান', *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ২, দ্বিতীয় সংস্করণ, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

মোহাম্মদ হাননান ২০০৬, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, ১৮৩০-১৯৭১*, তৃতীয় মুদ্রণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

সলিমুল্লাহ খান ২০১০, *আহমদ ছফা সঞ্জীবনী*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

Rounaq Jahan 2001, *Pakistan : Failure in National Integration*, Second Impression, The University Press Limited, Dhaka.